জলপায়রা

প্রেমেন্দ্র মিত্র

ত্রিবেণী প্রকাশন
১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

শ্রীমতী অঞ্জলি চট্টোপাধ্যায় ও

শ্রীযুক্ত উদয়ন চট্টোপাধ্যায়কে

পরম স্নেহ ও প্রীতির সঙ্গে

প্রেমেন্দ্র মিত্র

সূচীপত্র

জল-পায়রা

আফজল সাহেব একটু হাসলেন।

হাসিটা অবশ্য মুখে নয়, তাঁর চোখেই টের পাওয়া যায় আজকাল। শরীরের একটা অঙ্গের সঙ্গে মুখের একটা দিক পক্ষাঘাতে অসাড় হয়ে আছে। পুরুষ্টু মাংসল গালের অন্যদিকেও কোন ভাবান্তরের ছাপ পড়ে না। পড়ে শুধু চোখে। যে চোখ আটাত্তর বছর ধরে সকৌতুকে নির্ভয়ে জীবনের অনেক কিছু দেখেছে, বুঝেছে ও হেসেছে।

বিরাট দশাসই পুরুষ, দামী মেহগনির সেকেলে কাজ করা প্রকাণ্ড খাটটা জুড়েই শুয়ে আছেন।

আর শুধু খাটটা কেন, বিছানায় শোয়া অবস্থাতেই সমস্ত ঘর মায় বাড়িটা এখনো তিনি যেন জুড়ে আছেন। ঘরে লোকজন আরো আছে কিন্তু তারা যেন ফালতু ফাউ। আফজল সাহেবের একটা ফুঁয়ে তারা যেন এখুনি উড়ে যেতে পারে।

আফজল সাহেব জীবনে অনেক কিছু অবলীলাক্রমে এমন উড়িয়ে দিয়েছেনও বহুবার। মানুষ জন, প্রতিপত্তি, সম্মান, ঐশ্বর্য।

কিন্তু সব কিছু আবার যেন প্রচণ্ড চুম্বকের টানে তাঁর চারিধারে এসে জুটেছে।

টাকার পাহাড়ের প্রায় চূড়োয় উঠে আবার দেউলে হয়েছেন তিনবার,—সাদিও তাই।

সে অতীতের কিছু চিহ্ন আছে, কিছু নেই।

আছে ওই শীর্ণ রুগ্ন নাতিটা। তাঁর তাজা টগবগে রক্ত এক পুরুষ বাদেই অমন ফিকে জোলো হয়ে যাবে কে জানত!

হতভাগা আবার অতি সৎ ধার্মিক চরিত্রবান। কি সব নাকি কেতাব লেখে! বাজারে খুব নাম।

বড় বড় হোমরা চোমরা ওপর-মহলের অনেকে তাঁর কাছে কতবার তারিফ করেছে আকবরের,—বাহাদুর নাতি আপনার! কি লেখা লিখছে!

কেউবা একটু বেশী আস্কারা নিয়ে বলেছে, "ওই নাতির নামেই বেঁচে থাকবেন।"

আফজল সাহেব একবার নিজে পড়বার চেষ্টা করেছিলেন, হতভাগাটা কি লেখে?

হেসে তারপর আকবরকে বলেছিলেন, "ইনিয়ে বিনিয়ে ওসব কেচ্ছা লিখে কি হবে? মরদ হ'লে ওসব লেখবার দরকার হয় না।"

শীর্ণ রুগ্ন ফ্যাকাশে আকবরের চেহারা, কিন্তু তার চোখেও সেই অদ্ভুত কৌতুকের হাসি, আরও বুঝি তীক্ষ্ণ।

সে বইটা কেড়ে নিয়ে শুধু বলেছিল, "এ সব বাজে কেতাব পড়েন কেন! আখিরের কথা ভাবুন।"

অন্য সময় হলে আফজল সাহেব গালাগাল দিয়ে ভূত ভাগাতেন, কিন্তু সেদিন কিছু বলতে পারেন নি।

এক আকবরের কাছেই এরকম হার তাঁকে মাঝে মাঝে মানতে হয়।

আজ যেমন হয়েছে।

ডাক্তার হকিম কবিরাজ কিছুদিন ধরে আফজল সাহেব কাছে ঘেঁষতে দেন না। কেউ কিছু বলতে গেলে কুৎসিত একটা গাল দিয়ে বলেন, "দালালী কত পাও বল ত! গাঁটকাটারা পকেট কাটলে তবু টের পাই না, আর এরা যে গাঁটও কাটে আবার দণ্ডেও মারে।"

মুখের পক্ষাঘাতের দরুণ কথাগুলো জড়ানো হলেও বোঝা যায়। অন্ততঃ ঝাঁঝটা ত বটেই।

তবু আজ আকবর নিজেই হকিম ডেকে এনেছে।

সেই হকিমের কথাতেই আফজল সাহেবের চোখের হাসি।

"কি খেতে ইচ্ছে করে আপনার?"—কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করেছে হকিম।

আফজল সাহেবের চোখের হাসি দেখতে না পেয়ে, কথাটা শুনতে পাননি মনে করে আর একটু গলা চড়িয়ে হকিম প্রশ্নটা আবার শোনাল।

মুখে ভাবান্তর নেই। শুধু যে হাতটা ভালো আছে তাই তুলে আফজল সাহেব কানে আঙুল দিলেন।

ঘরে আর যারা ছিল তারা প্রমাদ গণল। আকবর শুধু শান্ত গলায় বললে, "কানে উনি ভালই শুনতে পান।"

হকিম লজ্জিত। কিন্তু আফজল সাহেবকে আর চটতে দেখা গেল না।

জড়িয়ে জড়িয়ে যা বললেন, তার মানে বোঝা গেল এই যে, এখনো তিনি সহজে মরছেন না, অনেকদিন দুনিয়াকে আরো জ্বালাবেন, সুতরাং শেষ খাওয়ার এখনো অনেক বাকি!

শেষ খাওয়ার কথা মোটেই সে বলেনি, তাঁকে সারিয়ে আবার সে দুপায়ে খাড়া করে তুলবে, সেইজন্যেই সবরকম খোঁজখবর তাকে নিতে হচ্ছে, বোঝাতে গিয়ে হকিম গলদঘর্ম হয়ে উঠল।

আফজল সাহেবের চোখ তখনও হাসছে। জড়িয়ে জড়িয়ে আবার কি বললেন।

হকিম বুঝতে না পেরে বিমূঢ়ভাবে আকবরের দিকে তাকাল।

আকবর বুঝিয়ে দিলে। আফজল সাহেব বলছেন,—"দু পায়ে

খাড়া হয়ে কি হাতী ঘোড়া হবে। সাদি আর একটা করতে চাই যে! পারব?”

হকিম একটু হকচকিয়ে গেল। এ সব প্রশ্নের জবাব ত' তার মুখস্থ। কিন্তু ঠাট্টা কি না ঠিক ধরতে না পেরে আমতা আমতা করে বলবার চেষ্টা করলে,—“আজ্ঞে তা কি বলে, আপনার বয়সেও...”

আকবরই তাকে উদ্ধার করলে। “আগে সারিয়ে তুলুন তার পরে ত' সাদি।”

“হ্যাঁ হ্যাঁ যা বলেছেন।” হকিম নিষ্কৃতি পেয়ে বাঁচল, “সারিয়ে ত তুলবই। তাই জিজ্ঞেস করছিলাম প্রথম, কি খেতেটেতে সাধ যায়।”

আফজল সাহেবের ঠোঁট নড়ল। হকিমেরও এবার কথাগুলো বুঝতে কষ্ট হল না।

আফজল সাহেব পোলাও কালিয়া খেতে চান।

“বেশ ত, বেশ ত, পোলাও কালিয়াই খাবেন আবার, কিন্তু এখন মানে...”

হকিমের কথা শেষ হ'ল না। পাহাড়ের ভেতর থেকে যেন একটা চাপা গর্জন বেরিয়ে এলো। তেমন জড়ানোও নয়।

“নিকালো!”

হকিম প্রথমে কাঠ। আকবর দাদুকে চেনে। সে হল্‌কাটা বেরিয়ে যাবার সময় দিলে।

আফজল সাহেব জড়ানো গর্জনে এবার বুঝিয়ে দিলেন,— পোলাও মাংসই যদি না হজম করাতে পারে ত কিসের হকিমী দাওয়াই! মাংস না খেতে দিলে দাওয়াই নিয়ে হকিম বিদেয় হোক।

হকিম একেবারে আনাড়ি অনভিজ্ঞ নয়। এতক্ষণে খানিকটা ধাতস্থ হয়ে অবস্থাটা বুঝে নিয়ে চালটাও ছকে ফেলেছে।

বললে, "পোলাও মাংসই আপনাকে খাওয়াব। অত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন! তবে দাওয়াই-এর সঙ্গে যা চলে সেই মাংসই ত দিতে হবে।"

"কি মাংস? ইঁদুর বেড়ালের!"—আফজল সাহেবের চোখে আবার সেই কৌতুক।

"আজ্ঞে না, ইঁদুর বেড়াল কেন হবে। পাখির মাংস, আসমানের পাখির।"

"কাক চিলও ত আসমানের।"—আফজল সাহেব ব্যাপারটা উপভোগই করছেন বোঝা গেল।

"সেরকম আসমানের হলে চলবে না। যে পাখি শুধু এখানকার দানাপানি খায় না। দুদিন এসে নিজের মুল্লুকে চলে যায়।"

"বুঝেছি! সেই পাখির ব্যবস্থাই করো। মাংস খাওয়া আমার চাই-ই।"—আফজল সাহেবের চোখে কৌতুকের হাসি না আর কিছু, আকবরও এবার বুঝতে পারল না।

আফজল সাহেবের ফরমাস। পাখির বাজারে সাড়া পড়ে ত' যাবেই।

গফুর মিঞা আজ ত্রিশ বছর আফজল সাহেবের বাবুর্চিখানায় সুদিনে দুর্দিনে সবরকম মাংস জুগিয়ে আসছে। সে গিয়ে হুকুম দিল নন্দ দাসকে—যে দামে হোক বালি হাঁস চাই, বালি হাঁস না মেলে ত' অন্য কিছু।

নন্দ দাস আসমানের উড়ো পাখির কারবারী। নন্দ দাস কড়া হুকুম দিলে ব্যাপারীদের—যেমন করে হোক আনা চাই।

ব্যাপারীদের ফড়েরা ছুটল চারতরফের দূর দূরান্তর জংলার গাঁয়ে।

কিন্তু বালি হাঁস দূরে থাক আসমানের উড়ে আসা কোন পাখি এখন কোথায়! সবে কার্তিক মাস। শীত না পড়লে তাদের ডানাই জোর পায় না।

হকিম বোধহয় তাই বুঝেই আসমানের উড়ে আসা পাখির বিধান দিয়েছিল। আফজল সাহেবও কি তাই বুঝে সায় দিয়েছিলেন!

নন্দ দাসের ব্যাপারীদের কোন খবর অধরদের গাঁয়ে পৌছয় নি।

আর গাঁ ত' নামে। ধূ ধূ করা বাদা বিলের মাঝখানে ছাড়া ছাড়া দূর দূর কটা গোলপাতার কুঁড়ে। বছরের আটমাস জলই শুকোয় না চারধারের।

ধানটা কিছু হয়। তাও ফলন যেবার ভালো সেবার জমিদারের কেমন করে যেন টনক নড়ে। কেঁদে ককিয়ে কাকুতি মিনতি করে গোমস্তা পাইকের কাছে যেটুকু তখন ভিক্ষে করে রাখা যায়। নইলে খাজনাও নেই যেমন তেমনি খোঁজও না। জমিদারের ওপর কথা কইবার জো-ও নেই। কইবে কে? কিসের ওপর? জমির ওপর দখলের একটা চিরকুটও কারুর কাছে নেই। পাইক লেঠেল পাঠিয়ে ঘাড় ধরে যখন খুশি বার করে দিতে পারে তেরিমেরি কেউ করতে গেলে।

যে যেমন করে পারে চালায়। সম্পত্তির মধ্যে হাঁস আছে, ছাগল আছে, গরুও কারো কারো। কচুরি পানায় ভরতি হলেও শালতি চলে সেই দূর লাতুড়ি স্টেশনের কাছ বরাবর। তারপর চার ক্রোশ খালের ধারে ধারে কাদায় পেছল বাঁধের ওপর দিয়ে হেঁটে গেলে ইষ্টিশান। চার ক্রোশ তাদের কাছে কিছু নয়। পা হড়কেই পৌঁছে যাওয়া যায়। হোগলা গোলপাতা নিয়ে কখনো, কখনো দূরের জমিদারী ভেড়ির চুরি করা মাছটা আশটা নিয়ে তারা সেখানে বেচে আসে। কিছু না জুটলে নিজেদের

জন্যেই ঘুনি' পেতে মাছ ধরে। আর শীতের মরসুমে সারা গাঁয়ের বারোয়ারী জাল দিয়ে জলার পাখিও কখনো সখনো।

কিন্তু পাখির সময় এখনও হয় নি।

ডোঙা বেয়ে ছিরুর কাছ থেকে ঘরে ফিরতে ফিরতে সেই জন্যেই অধর অবাক হয়ে থামল।

ঘরের কাছাকাছি দামে ভর্তি একটা নামাল জমি। সেখানে ঝটপট করে কি? আওয়াজটা যেন পাখির।

শেয়ালে পোষা-হাঁস ধরেছে ভাবতে পারত। কিন্তু শেয়াল জলায় গিয়ে সেঁধোবে কেন। তাও বাড়ির এত কাছে। এতক্ষণে সে কোথায় পগাড় পার হ'ত হাঁস মুখে নিয়ে।

তাছাড়া আওয়াজটা পোষা-হাঁসের নয় যেন।

ডোঙা ছেড়ে পাড়ে উঠে অধর জলার দিকে এগুলো।

ভর সন্ধ্যেবেলা এ জলাটায় নামতে মনটা একটু খুঁত খুঁত করে। ওই ছিরুর বাবার ওপরই মা মনসার এইখানেই কোপ হয়েছিল।

মনে মনে মনসার পায়ে গড় করে অধর জলায় নেমেই পড়ল শেষ পর্যন্ত। হাঁটুজল মাত্র। দামের জন্যেই পা বাড়ান দায়। প্রথমটা কিছু ঠাওরই হয় না আবছা অন্ধকারে। উঠে আসবে কিনা ভাবছে, হঠাৎ কাছেই এক খাবলা অন্ধকার যেন ঝটপট শব্দে লাফিয়ে উঠে কিছু দূরে ছিটকে গিয়ে পড়ল।

কোন রকমে পাখিটা জখম হয়েছে নিশ্চয়। নইলে দুহাত যেতেই অমন মুখ থুবড়ে জলে পড়ত না। এতক্ষণে কোথায় উধাও হয়ে যেত।

কিন্তু আকাশের সীমানা যে ডানায় মাপে, জখম হলেও তাকে ধরা সহজ নয়। পাক্কা আধটি ঘণ্টা অধরকে ক্ষ্যাপার মত তার পিছনে ছুটে সেই দাম আর বুনো ঘাসে ভরতি জলায় নাকানি

চোবানি খেতে হয়। হাত পা ছড়ে একাকার, জলে ঝাঁপাঝাঁপি করে সর্বাঙ্গ ভিজে সপসপে। পাখিটা বুঝি প্রাণ থাকতে ধরা দেবে না, অধরও ছাড়বার পাত্র নয়। বাদলাদিনের অন্ধকার এর মধ্যে গাঢ় হয়ে এসেছে। তবু ভয় ডর অধরের আর নেই।

সত্যিই শেষ পর্যন্ত ধরা পড়ল পাখিটা। ধরা পড়ল আশ্চর্য-ভাবে। ভয়ে ক্লান্তিতে দিশাহারা হয়েই বোধহয় অন্ধের মত পাখিটা পাখা লটপটিয়ে উড়ে এসে পড়ল একেবারে অধরের মুখের ওপরে।

অধরও তখন থমকে গেছে একেবারে। পাঁকের সঙ্গে মেশান সেই একটা অদ্ভুত গন্ধমাখা ভিজে পাখা দুটো তার মুখের ওপর সজোরে ঝটপট করে মনে হল যেন তার দমই বন্ধ করে দেবে। কটি মুহূর্ত ভয়ে দিশাহারা পাখিটার বুকের ধড়ফড়ানি যেন তার নিজের বুকের আওয়াজের সঙ্গে একাকার হয়ে তাকে বেঁহুশ করে দিলে। নিজের অজান্তেই হাত দুটো দিয়ে ধরে না ফেললে এবারও পাখিটা বোধহয় পালাত।

পাখিটাকে জম্পেশ করে দুহাতে ধরে মুখ থেকে হিঁচড়ে ছাড়িয়ে অধর হাঁপাতে হাঁপাতে দাম ঠেলে পাড়ে উঠল। উত্তেজনায় ক্লান্তিতে তার পা তখন টলছে।

পাড়ের ওপরই কার সঙ্গে যেন ধাক্কা লাগল একটু। অধরের খেয়াল নেই কিছুর। তার সব কিছু সাড় ওই দুহাতে শক্ত করে ধরা পাখিটায়। পাখিটার বুকের কাঁপুনি তার হাতের ভেতর দিয়ে ঢেউ খেলে যাচ্ছে সমস্ত শরীরে। সেই একটা অদ্ভুত বুনো গন্ধ। না হাঁস মুরগীর নয়, আর কিছুর।

ধাক্কার পর খিলখিল করে হাসিতে অধরের হুঁস ফিরল।

"আচ্ছা বেহুঁস মানুষ ত! খালেই ফেলে দিচ্ছিলে যে।"

অধর থামল, কিন্তু মুখে তার তবু কথা নেই।

সৈরভীই কাছে এসে বললে, "মুখে রা নেই কেন! নেশাভাঙ

করেছ নাকি।" হঠাৎ পাখিটা ঝটপট করে উঠতে চমকে উঠে বললে, "ওমা ওটা আবার কি!"

"বাদার পাখি। অনেক কষ্টে ধরেছি।" অধর এখনও হাঁপাচ্ছে, "কি পাখি দেখতে হবে চল।"

অধর পা বাড়াল, কিন্তু দু পা গিয়েই আবার থমকে দাঁড়াল।

"তুই এখন এখানে কোথা থেকে?"

আবার সেই খিল খিল করে হাসি। শরীরটা অধরের গায়ে যেন ঢেলে দিয়ে সৈরভী বললে, "তোমার ঘরে খুঁজতে গেছলাম যে। ঘরে নেই দেখে এদিক পানে এলাম দেখতে।"

ভিজে পাখিটার আর সৈরভীর উষ্ণ স্পর্শ শরীরের মধ্যে যেন এক হয়ে মিলে যাচ্ছে। তবু অধর সভয়ে বললে, "এই রাতে আমায় ঘরে খুঁজতে এসেছিলি?"

"হ্যাঁ গো হ্যাঁ, খুঁজতে ত আমিই আসি। তুমি ত আর বেটাছেলে নও, আমিই কাচা দেবো এবার।"

অধরকে চুপ করে থাকতে দেখে আবার বললে, "ভয় নেই গো ভয় নেই। বিকেলে লাতুড়ি গেছে, সেই কাল ফিরবে।"

অধর কিছু না বলে আবার এগোল। মনটা গেছে কেমন খিঁচড়ে।

ঘরে পৌঁছে কুপির আলোয় পাখিটাকে দেখে ভয়-ডরের কথা কিন্তু তার আর মনে রইল না।

"জল-পায়রা! দেখেছিস্ সৈরভী! কেমন করে ডানাটা ভেঙে গেছে, তাই আর পালাতে পারে নি।"

সৈরভী পাশের রান্নাঘরে গিয়ে আর একটা কুপি জ্বেলে কি নাড়াচাড়া করছিল। বেরিয়ে বললে, "অত আগবাড়ন্ত হলে ডানা ভাঙবে না! উত্তুরে হাওয়া না দিতেই এত ছটফটানি কিসের!

আমার মত কারুর টানে এসেছে বোধহয়।" আবার সৈরভীর হাসি।

"একটু স্থতোটুতো দে সৈরভী, একটু খয়ের চুণ দিয়ে ডানাটা বেঁধে দিই।"

"ও আমাদের দয়ার অবতার রে! থাক্, আর আধিক্যেতায় কাজ নেই! কাল সকালে কোথায় হজম হয়ে যাবে, উনি এখন ভাঙা ডানা জুড়ছেন।"

অধর বিমূঢ়ভাবে চেয়ে রইল খানিক সৈরভীর দিকে। বাদার পাখি ধরা মানে যে কি, সে যেন ভুলেই গিয়েছিল। তবু একবার প্রতিবাদ করে উঠল, "না না, এ পাখি আমি মারতে দেব না।"

"না মারতে দেবে না! পাখি তোমার গুরুঠাকুর। দাঁড়াও আগে রাঁধি, তারপর খেয়ে বোলো।"—সৈরভী রান্নার জোগাড় করতেই আবার যাচ্ছিল, অধর একটু শক্ত হয়ে বললে, "না রাঁধতে টাধতে তোকে হবে না। তুই ঘরে যা।"

"ঘরে যাব!" সৈরভী ফোঁস করে ফিরে দাঁড়াল, "তাড়িয়ে দিচ্ছ?"

সৈরভীর এ মূর্তি দেখলে অধর কেমন বেদিশে হয়ে যায়, প্রচণ্ড একটা টানের সঙ্গে অদ্ভুত একটা ভয় মিশে হাতপাগুলো বশে থাকে না। আমতা আমতা করে ক'টা ঢোক গিলে বললে, "না, ভাবছিলাম কেউ যদি দেখে!"

"কে দেখবে। বললাম না, লাতুড়ি গেছে। কাল ফিরবে।"

"কিন্তু আর কেউ ত আসতে পারে! ছিরুই যদি আসে।"—অধর শেষ চেষ্টা করলে ভয়ে ভয়ে।

"না আসবে না। এমন সময় কারুর আসতে দায় পড়েছে! এই বেহায়া কালামুখীর মত কেউ ত আর অন্তর-জ্বলুনীতে জ্বলছে না যে নিজে সেধে মুখ পোড়াতে আসবে।" সৈরভী মুখ ঝামটার

সঙ্গে নিটোল শরীরের একটা মন-তোলপাড়-করা ঝাঁকানি দিয়ে ফিরে রান্নার চালার দিকে চলে গেল।

অধর নিরুপায়। সৈরভীকে জোর করে বাড়ি পাঠাবার তার সাধ্য নেই। মনও কি চায়! কিন্তু দামুর সেদিনের কথাগুলোও ভোলা যায় না যে। বলেছে, বাদায় জ্যান্ত পুতে রেখে দেবে!

তা দামু পারে। কাকপক্ষীটিও টের পাবে না এ ধূ-ধূ জলার দেশে। আর টের পেলেও মুখ ফুটে কিছু বলবে, কার এত বুকের পাটা।

সৈরভীর ওপর তার রাগ হয়। এই রাক্ষুসী টান তারই ওপর কেন? সে ছাড়তেও পারে না, ছেড়েও দিতে পারে না নিজেকে প্রাণ খুলে। কতবার ভেবেছে পালিয়ে চলে যাবে কোথাও! কিন্তু যাবে কোথায়? জ্ঞান হওয়া থেকে এই বাদাই চেনে। তিনকুলে কেউ নেইও। আর যাবার কথা ভাবলেও বুকটায় কেমন মোচড় দিয়ে ওঠে।

এতক্ষণে একটা দড়ি দিয়ে পাখিটার পা দুটো অধর বেঁধে ফেলেছে। মেঝের ওপর ফেলতেই পাখিটা শুধু ডানা নেড়ে ছট-ফটিয়ে খানিকটা হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে চলে গেল। কুপিটাই বুঝি উল্টে দেয়। অধর গিয়ে আবার পাখিটাকে ধরল। কিন্তু ধরবার আগে পলকা ঠোঁট দিয়ে ঠোকরাবার কি চেষ্টা বেচারার! ঠোকরে একটু লাগে কিন্তু হাসিও পায়। কালো পুঁতির মত চোখ দুটো কুপির আলোতেই দেখা গেল। তাতে রাগ না ভয় না হুতোশ বোঝা যায় না, কিন্তু মায়া হয় কেমন। আদেখলে মায়া অধর বোঝে। এমন কত পাখি কেটেছে। এটাকেও কাটতে হবে খানিক বাদে।

কিন্তু কাটা আর হল না।

উনুন ধরিয়ে যোগাড়-যন্তর করে সৈরভী ঘরে এল।
"কই! ঠুঁটো হয়ে এখনো বসে আছো? পাখীটা কাটবে কে, আমি?"

অধর জবাব দেবার আগেই সজোরে দরজাটা খুলে গেল। শুধু ভেজানই ছিল।

দামুই দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে। আর দুজনে দুদিকে কাঠ।

"হুঁঃ লাতুড়ি গেছলাম বলে বড় সুবিধে হয়েছে, না?"

একটা চাপড় খেয়ে অধর মেঝেয় হুমড়ি খেয়ে পড়ল। দামু গিয়ে আবার ধরবার আগেই কোনরকমে উঠে দরজা দিয়ে পড়ি কি মরি হয়ে বাইরে ছুট!

"শালা নেংটি ইঁদুরের বাচ্চা!"—দামু পেছু নেবার চেষ্টা করলে না। সৈরভীর দিকেই ফিরল এবার।

"চামচিকেটাকে যখন খুশি ধরব। তার আগে তোকেই এখানে শেষ করি।"

"করো না।" ঘাড় বেঁকিয়ে শরীর টান করে সৈরভী বেপরোয়া।

দামু হাতটা ওঠাতে গিয়ে একটু থামল। শেষপর্যন্ত চড়টা অবশ্য বাদ গেল না।

সৈরভী ছিটকে গিয়ে দেয়ালে ধাক্কা খেলে। সেখান থেকে মাথার চুলের মুঠি ধরে টেনে আনছে এমন সময় পাখিটা ছটপটিয়ে উঠল মেঝেয়।

"ওটা কি!"—চমকে দামু সৈরভীর চুল ছেড়ে দু পা পিছিয়ে গেল।

সৈরভীর এখনও সেই খিলখিল করে হাসি! "কি আমার বীরপুরুষ-রে। পাখির আওয়াজে ভিরমি যায়!"

"পাখি! কি পাখি? কোত্থেকে?"

"কি পাখি দেখো না! অধর এই সাঁঝের বেলায় ধরেছে।"

দামু মেঝেতে উবুড় হয়ে বসে পাখিটা ধরল। "আরে জল-পায়রা যে! কোথায়, পেল কোথায়?"

"এই ত খালের ধারে যুগদ'য়ে। ওইটেই রেঁধে দিতে এসেছিলাম।"

সৈরভীও বসল।

"রাঁধতে এসেছিলি!" দামু হাতটা তুলেও কিন্তু মারল না। হেঁচকা দিয়ে সৈরভীকে টেনে তুলে বললে, "চ।"

"কেন এখানেই রাঁধি না? যোগাড় সব আছে।"

"হাঁ এখানেই রাঁধবি বই কি!"—দামু এক ঘা দিলে সৈরভীর মাথায়। "এ পাখি রাঁধতে দিচ্ছি! এ পাখি এখন নিয়ে গেলে দুনো দাম তা জানিস? লাতুড়ি যেতে মুকুন্দর কাছে তাই শুনেই ত' ফিরে এলাম। শালা চামচিকেটা খুব পেয়ে গেছে ত! চুষুক এখন কলা!"

পাখি আফজল সাহেবের বাড়ি পৌঁছল। গফুর মিঞাই পৌঁছে দিলে খুশিতে ডগমগ হয়ে।

আকবর কোথায় বেরুচ্ছিল। সামনে পড়তে গফুর মিঞা রঙ-করা দাড়ির ফাঁকে এক গাল হেসে বললে, "পেয়েছি হুজুর। সাত মুল্লুক চষে ফেলে পেয়েছি।"

ঠ্যাং দুটো ধরে গফুর পাখিটাকে ঝুলিয়ে ধরল সামনে। ভাঙা ডানা নেড়ে পাখিটা ছাড়া পাবার দুর্বল চেষ্টা একবার করে যেন হাল ছেড়ে দিলে।

"কি পাখি?" আকবর জিজ্ঞাসা করলে।

"আজ্ঞে ওদিকে জল-পায়রা বলে হুজুর। আসমানের পাখি, শীতের মেহ্‌মান হতে আসে বাদায়।"

আকবর একটু হাসল। গফুর মিঞার ভেতরও কবিত্ব আছে।

"এমন সময়ে পাওয়া যায় না হুজুর!" গফুর নিজের বাহাদুরিটা আর একটু জাহির করে পাখির মাথাটা এক হাতে তুলে ধরল।

আকবর দেখতে পেল চোখ দুটো, নিষ্প্রভ কালো পাথরের কুচির মত। কিছুই সে চোখের ভাষায় নেই হয়ত। তবু পলকের জন্যে মনের ভুল হয় কেন?

গফুর সামান্য একটু বুঝি অসাবধান হয়েছিল। পাখিটা হঠাৎ পাখা ঝাপটে হাত ফসকে পড়ে গেল।

"যাবি কোথায়!" ডানা নেড়ে কেৎরে একটু না যেতেই গফুর পাকা হাতে খপ করে ধরে ফেলে বললে, "পালাবার জো নেই হুজুর। ডানাই গেছে ভেঙে।"

"ভেঙে দাওনি ত!"

গফুর রীতিমত ক্ষুণ্ণ হল। "কি বলেন হুজুর! খাবার জিনিস খাই, যে চায় জোগাই। তা বলে অবোলা জানোয়ারের সঙ্গে বেহুদা দুশমনি করব!" একটু থেমে আবার বললে, "আমার কিন্তু ভালো বখশিস চাই হুজুর।"

আকবর ভালোরকম বখশিসই দিলে, আর হুকুম দিলে পাখিটাকে তার ঘরেই রাখতে। কোন রকমে খোয়া গেলে আর পাবার নয় বলেই বোধহয়।

পাখি রান্না হবে কি না ওসমান জিজ্ঞাসা করতে এল বিকেলে।

"আগেই ত বলেছি, হবে না।"—আকবর একটু রেগেই উঠল।

ওসমান তবু চলে গেল না। দুবার মাথা চুলকে বললে, "আজ্ঞে সাহেব রাগ করছেন।"

"সে আমি বুঝব।"

ওসমান দ্বিধাগ্রস্তভাবে চলে গেল।

একটা ঝুড়িতে পাখিটা চাপা আছে। আকবর ঝুড়িটা গিয়ে তুলল। মাথাটা বুকের ভেতর গুঁজে পাখিটা ঘুমোচ্ছে বোধহয়।

আকবর একটু ছুঁতেই ধড়ফড় করে উঠে পাখা ঝাপটে পালাবার চেষ্টা করলে। আকবর তাড়াতাড়ি চাপা দিলে ঝুড়িটা। তারপর লেখার টেবিলে গিয়ে বসল। লেখাটা এগুচ্ছে না। কেমন জট পাকিয়ে গেছে।

হঠাৎ ভাবনার খেই ছিঁড়ে গিয়ে ডানার ঝটপটিতে চমকে উঠল। না, গহন কোন সুদূর আকাশে নয়, ঝুড়ির ভেতরই পাখিটা ছটফট করছে।

সন্ধ্যের পর আফজল সাহেব নাতিকে ডেকে পাঠালেন।

কথা যেন আরো জড়িয়ে গেছে, আরো মৃদু, থেমে থেমে। কিন্তু চোখ এখনও উজ্জ্বল।

"কই, পাখি ত এসেছে! আমার কালিয়া কই?"

"হবে, কিন্তু দাওয়াই না খেলে কালিয়া হজম হবে কিসে? ব্যায়রাম যে বাড়ছে।"

"দাওয়াই খেলে আরো বাড়বে।"

"দাওয়াই আপনি খাবেন না কিছুতে?"

"না। কালিয়া বানানে বোলো।" —আফজল সাহেবের চোখে সেই হাসি।

"বেশ আপনি ডেকে হুকুম দিন, আমি পারব না।"—আকবর চলে যাবার চেষ্টা করে।

সক্ষম হাতটা নেড়ে তাকে থামিয়ে আফজল সাহেব বলেন,—"বুঝেছি, পাখিটার ওপর লোভ হয়েছে। নিজেই খেতে চাও।"

"তাই যদি খাই।"

"মুরোদ আছে খাবার!"

হাতটা নেড়ে নাতিকে পাশে বসতে ইঙ্গিত করেন আফজল

সাহেব। তারপর আবার বলেন, "খাবার জন্যে সব কিছুই ত রেখেছিলাম। মুখে হাতটাও ত তুলতে পারলি না।"

আকবর উত্তর দেয় না।

হঠাৎ আফজল সাহেবের জড়ানো স্বর ঝাঁঝালো হয়ে ওঠে।—"বিয়ে-সাদি করবি, না সব দান-খয়রাত করে দিয়ে যাবো !"

"তাই যান।" আকবর উঠে পড়ে।

"যাচ্ছ কোথায় ?"

"কাজ আছে।"

"কাজ ত যত ঝুটা কেচ্ছা বানানো। গালে কে থাপ্পর মেরে গেছে তারই শোধ কেচ্ছায়।"—আফজল সাহেব হাঁপাতে থাকেন এতগুলো কথা উত্তেজিতভাবে বলে'।

আকবর প্রথমটা যেন পাথর হয়ে যায়। তারপর ধীরে ধীরে চলে যাবার জন্যে পা বাড়ায়।

অত্যন্ত নিষ্ঠুর ঘা দিয়েছেন বুঝেই আফজল সাহেব আরো যেন ক্ষিপ্ত হয়ে ডাক দেন, "দাঁড়াও।"

আকবর দাঁড়ায় না।

একটা ঘন দুর্ভেদ্য ধোঁয়ায় চোখের দৃষ্টি, মন সমস্ত যেন আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে মনে হয় আফজল সাহেবের।

এই হয়ত শেষ। হোক্। আফজল সাহেব তৈরিই আছেন।

কিন্তু শেষ এখনও নয় দেখা যায়। ঘোরটা কাটতে অনেকক্ষণ লাগে অবশ্য। মাথাটা পরিষ্কার হবার পর প্রথম আফশোষ হয়। আকবরের সবচেয়ে লুকোন সবচেয়ে গভীর ক্ষতের জায়গায় অন্যায় করে আঘাত দিয়েছেন।

আকবরের মন তিনি বুঝতে পারেন না। মন ত নদীর স্রোত। তাতে আবার দাগ কিসের ! আকবরের বয়সে কতজন এসেছে গেছে, নামও ত মনে রাখেন নি।

কিন্তু নাই আকবরকে বুঝুন, নিজের মাপ দিয়ে তাকে মাপার ভুল আর করবেন না।

বংশ থাকবে না! আফজল সাহেবের হাসি পায়। লোকে বলে তাই, নইলে সত্যি বলতে গেলে কিছুই তাতে আসে যায় না। ছনিয়া যিনি পয়দা করেছেন সে ভাবনা তাঁর।

সকালে আকবরকে আবার ডেকে পাঠালেন।

"লে আও সব ডাক্তার হকিম। সব দাওয়াই একসঙ্গে খাব।"

আকবর হাসল।

"আর ওই পাখিটা খেয়েছিস্?"

"না।"

"উড়িয়ে দিয়েছ বুঝি বেওকুফ মেহেরবান?"

"ডানা যে ভাঙা, উড়বে কি করে!"—আকবর আবার হাসল।

"বেশ, ডানা সারাও, তারপর ছেড়ে দিও। আমার নজর দেওয়া পাখি যেন কারুর ভোগে না যায়।"

"জো হুকুম।"—মাথাটা নুইয়ে বললে আকবর।

ঘরে গিয়ে আকবর ঝুড়িটা তুলল। জলের একটা খুরি ছিল ভেতরে। উল্টে জলটা গড়িয়ে গেছে। খাওয়ার জন্যে দেওয়া ধান কটা চারিদিকে ছড়ানো। পাখিটা পড়ে আছে মেঝের ওপর। বুকের ভেতর মাথা গুঁজে নয়। গলাটা লম্বা করে মেঝের ওপর রেখে। পিঁপড়ে এসেছে এরই মধ্যে। পালকে লেগেছে। লেগেছে সেই কালো চকচকে পাথরের কুচির মত চোখে, যে চোখের ভাষার কোনো মানেই বোধহয় হয় না।

দৃষ্টি

উষাপতির সঙ্গে এককালে আমার পরিচয় ছিল। হ্যাঁ, উষাপতি রক্ষিতের সঙ্গেই, যার উ, র, অক্ষর দুটি কোণে লেখা থাকলেই যে কোন কালির আঁচড়-টানা কাগজ নিয়ে টানাটানি পড়ে যায়।

এ খবরটা দেওয়া অবশ্য আজ আত্মপ্রচারের মত শোনাতে পারে, কিন্তু যখনকার কথা বলছি, তখন উষাপতির নাম দেশ বিদেশে দূরে থাক তার পাড়াতেও ছড়ায় নি। বিদেশী পর্যটকেরা এসে উষাপতির এক টুকরো রং-লেপা কাগজ কিনতে হুমড়ি খেয়ে পড়ত না, তার তুলির টানের গভীর অর্থ বার করতে দেশ বিদেশের খানদানি পত্রিকায় ভারী ভারী প্রবন্ধও লেখা হয় নি।

উষাপতি তখন ছবি আঁকা ছেড়ে আফিসের চাকরী খুঁজছে।

অনেককাল আগের কথা। বিজ্ঞাপনের বাজারে শিল্পীদের কদর তখনও তেমন হয়নি।

তবু উষাপতি রক্ষিতকে সেই পরামর্শ-ই দিয়েছিলাম মনে আছে। বলেছিলাম বিজ্ঞাপনের ছবি আঁকতে। অন্তত পেট চালাবার জন্যে দু-চারটে সেরকম কাজ নিলে দোষ কি?

রক্ষিত রাজি হয়েছিল। তাকে নিয়ে গিয়ে এক বড় শিল্প-প্রতিষ্ঠানের প্রচার-সচিবের সঙ্গে পরিচয়ও করিয়ে দিয়েছিলাম। কাজও দু-একটা সে পেয়েছিল। কিন্তু রাখতে পারেনি।

শুকনো মুখে আর একদিন এসে হাজির হয়েছিল আমার অফিসে। বেশ একটু অপমানিত হয়েই তাকে নাকি ফিরতে

হয়েছে। প্রচার-সচিব তার ছবি দেখে হেসেই খুন। বলেছেন, কাগজের ওপর এ কাকের ঠ্যাং বকের ঠ্যাং আঁকবার জন্যে পয়সা দিয়ে লোক নেবার কি দরকার? রঙের বাটিতে আঙুল ডুবিয়ে তিনি নিজেই এ রকম কাগজ নোংরা করতে পারতেন।

রক্ষিতকে কি সান্ত্বনা দিয়েছিলাম মনে নেই। রক্ষিতও তার পর অনেকদিন আসেনি। কি তখন সে করছে জানতাম না।

শা-পুর অঞ্চলে একটা জমি দেখতে গিয়েছিলাম। ফেরবার পথে হঠাৎ রক্ষিতের সঙ্গে দেখা।

অত্যন্ত অপরিচ্ছন্ন বস্তি অঞ্চল। পুরোপুরি বস্তিও নয় আবার। শহর যেখানে তার নোংরা পা ঠেলে দিয়েছে, গ্রাম সেখান থেকে যাই যাই করছে। খড়ের সঙ্গে খাপরার চাল কাঁচা নর্দমার ওপর যেমন ঝুলে আছে, তেমনি নারকেল খেজুরের পাহারায় সবজির বাগানও চোখে পড়ে। করুণ কুশ্রীতা তাই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে আরও।

উষাপতিকে এখানে দেখে অবাক হলাম। তার কি এমন হাল হয়েছে তাহলে, যে এই অঞ্চলে এসে বাসা নিতে হয়!

কিন্তু রক্ষিত ত সে জাতের মানুষ নয়! ট্যাঁক তার গড়ের মাঠ হলেও নজর তার সব সময়ে উঁচু। ঋণ করেও ঘি খাবার সখ সে চিরকাল মিটিয়ে এসেছে।

না, পোষাক পরিচ্ছদে সে রকম কোন ইঙ্গিত নেই। সেই তার ধোপদুরস্ত ধুতি পাঞ্জাবী, সেই বাসন্তী রঙের উড়ুনিটি তার নিজস্ব ধরণে কাঁধে ফেলা। মাথার লম্বা চুল তেমনি সযত্নে ঝাঁকড়া করে রাখা।

আমায় দেখে রক্ষিত থেমেছিল। কাছে আসতে মুখের প্রসন্ন হাসিতে বুঝলাম মেজাজটাও খোস।

"ব্যাপার কি রক্ষিত?"—জিজ্ঞাসা না করে পারলাম না, "ছবির মাল মশলা কি এইখানেই খুঁজছ?"

"খুঁজছি না ভাই, পেয়েছি। একেবারে সোনার খনি।"

জিজ্ঞাসা করলাম,—"মানে?"

"মানে দেখবেই চল না। এখান থেকে দু পা।"

সেদিন কৌতূহলী হলেও রক্ষিতের সঙ্গে যেতে পারিনি। তারপর অবশ্য অনেকবারই রক্ষিতের সোনার খনিতে গিয়েছি এবং তার আবিষ্কার থেকে শুরু করে পরিণামের শেষ দাঁড়ি পর্যন্ত যা জেনেছি তার মধ্যে গল্পের মশলা কতটুকু ঠিক বুঝিনি বলেই বোধহয় এতদিন মনের চোর-কুঠুরীতে তা অবহেলায় পড়েছিল।

সেদিন অনেক কাল বাদে ঊষাপতি রক্ষিতের নতুন বাড়িতে গিয়ে স্মৃতির সেই পুরানো ছেঁড়া পাতাগুলো আবার যেন কোথা থেকে উড়ে এল। সে ছেঁড়াখোঁড়া স্মৃতির টুকরো দিয়ে জুৎসই গল্প সাজানো যায় না জানি, তবু সেগুলোকে যে কোনও ভাবে প্রকাশ না করে স্বস্তি নেই যেন।

রক্ষিতের বাড়ি গিয়ে স্মৃতির এ আলোড়ন যা দেখে অনুভব করেছিলাম তা একটা তুলোট কাগজের বাণ্ডিল। পোকায় না কাটুক বেশ জীর্ণ হয়ে এসেছে। সেই কথাই আগে বলি।

চাকরীর ব্যাপারে অনেকদিন বিদেশে কাটাতে হয়েছে। বাইরে থাকলেও রক্ষিতের সব খবরই পেয়েছি। উল্কাবেগে খ্যাতির শিখরে তার আরোহন থেকে তার নতুন বাড়ি করা পর্যন্ত। একদিন তারপর খোঁজটোজ নিয়ে সেখানে গিয়ে হাজির হলাম।

ঊষাপতির ওখানে গেলে সত্যিই মনটা জুড়িয়ে যায়।

শহরের ভীড়, গোলমাল, তারপর নোংরা শহরতলীর কুশ্রীতা ছাড়িয়ে একটু ফাঁকা সবুজের আভাস, তার পরেই ঊষাপতির ছোট্ট সুন্দর একতলা বাড়িটি।

চমক না দিয়ে কি করে চোখ টানতে হয় রক্ষিত তা জানে। যেমন তার ছবিতে, তেমনি সব কিছুতে।

বাড়িটিতে পর্যন্ত।

রুচিবান লোকের বাড়ি বলে চেনা যায়। কিন্তু কোথাও সেটা গলা চড়িয়ে বিজ্ঞাপিত নয়—না গড়নে, না পরিবেশে।

একতলা অনেকখানি জমি-ঘেরা বাড়ি। চারিদিকে নীচু সাদা দেওয়াল। তাতে মাঝে মাঝে খয়েরি থাম। রাস্তা থেকেই দেখা যায় দেওয়ালের ওপারে যেন একটা লম্বা নাট-মন্দির শুধু দাঁড়িয়ে আছে।

এই নাট মন্দিরের মধ্যেই সব। রক্ষিতের থাকা, আঁকা আর ছবির রাশ রাখা।

বাড়ি-ঘেরা জমিটা আর কেউ হলে হয়ত সাজানো বাগান করত, কিন্তু উষাপতি তা করে নি। জমিটা প্রায় ফাঁকা, এক কোণে একটা শিউলি, মাঝখানে একটা শিশু, এলোমেলো ভাবে কয়েকটি দেশী বিদেশী গাছ—সবই যাকে বলে বৃক্ষ, লতা-গুল্ম নেই।

ভেতরে গেলেও সেই বিশৃঙ্খলা যেন। নাট-মন্দির যেন প্রদর্শনীর হল-ঘর। পর্দা দিয়ে এলোমেলো ভাবে ভাগ ভাগ করা। ছবির ছড়াছড়ি সর্বত্র। সাজাবার ছিরিছাঁদ নেই মনে হয় প্রথমে। খানিকটা দেখবার পর বোঝা যায় যে রাগ-রাগিনীর সুরুতে সুরের আলাপের মত রঙের একটা আলাপ যেন চলেছে আগাগোড়া। বাঁধাধরা বিন্যাস নেই, কিন্তু খেইও হারায় না।

ছবি দেখে, কফি খেয়ে পুরনো দিনের গল্প-গুজোব করে বিকেলটা কাটিয়ে চলেই আসছিলাম, রক্ষিতের অনুরোধে পড়ে একটু থেকে যেতে হল।

তার কাছে হামেশা যেমন আসে, তেমনি কজন মার্কিণ টুরিষ্ট এসেছে আলাপ করতে। ছু'চারটে ছবিও কিনে নিয়ে যেতে চায়। রক্ষিত তার নিজের পর্দা-ঘেরা কাজের জায়গায় আমায় বসিয়ে তাদের ছবি দেখাতে গেল। বলে গেল যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাদের বিদেয় করে আসছে।

একা একা বসে বসে রক্ষিতের সাজ সরঞ্জাম জিনিসপত্র দেখছিলাম। রক্ষিতের কাজের ধারা অদ্ভুত। শুধু একটা কাজ নিয়ে থাকলে তার হাত খোলে না। কামরায় তাই তিনটে ইজেলে তিনটে আলাদা ছবির রচনা চলেছে। কোনটা আরম্ভ, কোনটা প্রায় শেষ, কোনটা মাঝ পথে। এমনি একাধিক কাজে ঠোকাঠুকি খেয়েই নাকি মন তার বেগ পায়।

ঘরের খুঁটিনাটি আরও অনেক কিছু দেখতে দেখতে রঙ করা বাঁশের চোঙার মধ্যে রাখা কাগজের বাণ্ডিলটি খুঁজে পেলাম।

সেই বাণ্ডিল খুলে, হলদে-হয়ে-আসা জীর্ণপ্রায় কাগজগুলোতে আঁকা যে সব ছবি দেখলাম, তা যেন আমায় এক নিমেষে বর্তমানের সব কিছু থেকে ভাসিয়ে নিয়ে চলে গেল।

ছবিগুলো তন্ময় হয়েই দেখছিলাম, রক্ষিতের কথাতেই চমক ভাঙল। কখন সে তার কাজ সেরে পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে জানিনা।

"মনে আছে তাহলে!"

কিছু না বলে রক্ষিতের মুখের দিকে চাইলাম। জীবনের অনেক ঘাটে জলখাওয়া, অনেক আগুনের পোড়-খাওয়া উষাপতি রক্ষিত। একেবারে রাস্তার ধুলো থেকে খ্যাতি, অর্থ, প্রতিপত্তির শিখরে-ওঠা উষাপতি রক্ষিত। প্রশ্নটা কি সে স্বাভাবিক গলায় সহজ মানুষের মতই করেছে?

মনে হল, ক্ষণিকের জন্য মনে হল—না। উষাপতি রক্ষিতের

খ্যাতির কাঠামোতে বেশীর ভাগই হয়ত খড়, কিন্তু তবু পুরোপুরি ফাঁকি সে নয়। কোথায় গভীর হৃদয়ের কোন গহনে তার শিল্পী আত্মা আজও জাগ্রত।

মুখে তার ভাবান্তর না থাকলেও দুচোখে তাই চকিত বেদনার একটা ছায়া যেন দেখলাম।

সে বেদনা কার জন্য আমি জানি। তা অধর দাসের জন্যে—প্রতিমার 'চালচিত্তির' আঁকিয়ে যে অধর দাসকে একদিন রক্ষিত সোনার খনির মত আবিষ্কার করেছিল দৈবাৎ। যে অধর দাস তাকে চালের বাতায় গোঁজা কাগজের তাড়া থেকে তিন পুরুষের হারানো ঐশ্বর্যের সন্ধান দিয়েছিল।

ভাগ্যদেবতার মত রক্ষিতের জীবনে উদয় হয়ে যে অধর দাস কিছুদিন বাদে নিশ্চিহ্ন হয়ে বিশাল পৃথিবীতে হারিয়ে গিয়েছিল, তাকে খোঁজবার চেষ্টা রক্ষিত করেছে কিনা জানিনা, কিন্তু তাকে ভুলে যাওয়ার মত অকৃতজ্ঞ সে নয় এটুকু সেদিন বুঝে মানুষের প্রতি বিশ্বাস যেন ফিরে পেয়েছি।

বেশ কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থেকে জিজ্ঞাসা করলাম—"কোথায় আছে এখন অধর ?"

"জানিনা !"—বলে রক্ষিত চামড়ার একটা মোড়া টেনে বসে সিগারেট ধরাল।

"তোমার সঙ্গে শেষ দেখা কবে ?" আবার জিজ্ঞাসা করলাম।

রক্ষিত অত্যন্ত বিরক্তভাবে কি একটা কড়া জবাব দেবার জন্যে যেন আমার দিকে ফিরল। তারপর সামলাল নিজেকে। ক্লান্ত ভাবে বললে—"ওখানকার এক চট-কলে কি একটা কাজ নিয়েছিল ছাড়িয়ে আমার কাছে রাখতে চেয়েছিলাম। রাজী হয়নি। তারপর একদিন চট-কলের কাজ ছেড়ে দিয়ে কোথায় গিয়েছে কেউ জানেনা।"

একটু চুপ করে থেকে বললাম,—"এতদূর পর্যন্ত আমিও সব জানি। কিন্তু তারপর এই দশ বছরে আর তার কোন খোঁজ পাওনি? পাও বা না পাও চেষ্টা করেছ কি?"

"করেছি।"—বলে রক্ষিত উঠে পড়ল। তারপর সেই ছোট কামরার মধ্যে পায়চারী করতে করতে বললে—"বিশ্বাস কর, চেষ্টার কোনও ত্রুটি করিনি। কিন্তু অধর দাস ত খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে খোঁজ করবার লোক নয়। রাস্তার ধারের আগাছার মত সে অতি সাধারণ, অতি নগণ্য। পৃথিবীতে এরা যদি নিজে থেকে হারিয়ে যেতে চায় কার সাধ্য খুঁজে বার করে! তবু একমাত্র আশা ছিল এই যে, তরলার কাছে একদিন সে হয়ত ফিরে আসতে পারে। তরলা যতদিন ছিল ততদিন তাকে তাই যতদূর সাধ্য সুখে রেখে ও অঞ্চল থেকে নড়তে দিইনি। যদি অধর কোনদিন আসে। কিন্তু সে আশাও আর নেই।"

"কেন, কোথায় এখন তরলা?"

"নেই। আজ ছ'মাস হল মারা গিয়েছে।"

সেদিন বিশেষ কিছু আর কথা হয়নি। আমি চলে আসবার আগেই কোন রাজদূতাবাস থেকে ক'জন এসেছে রক্ষিতের সঙ্গে দেখা করতে। সুবিধে পেয়ে বিদায় না নিয়েই চলে এসেছি।

ফিরে এসে অধর দাসের কথাই ভাবছি। না, তাকে নিয়ে গল্প সাজানো যায় না। সাজানো উচিত নয়।

কতটুকু বা তার সম্বন্ধে জানি। প্রথম যেদিন রক্ষিতের সঙ্গে নোংরা নর্দমার পাশে একটি খাপরার ঘরের দরজায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম সেদিন দরজা খোলবার পর প্রথম যাকে দেখেছিলাম সে অধর দাস নয়।

পথে আসতে রক্ষিতের কাছে অনেক কথাই তখন শুনেছি।

কেমন করে কোন এক প্রতিমার চালচিত্র দেখে সে অবাক হয়ে পোটোদের পাড়ায় যায় খোঁজ করতে, কেমন করে সেখান থেকে খবর পায় যে বাপ-পিতাম'র পেশা ছেড়ে দিয়ে অধর দাস কোথায় কোন কারখানায় পেটের দায়ে কাজ করে। অধর দাসকে সেখান থেকে খুঁজে বার করে, কি ভাবে তার আশ্চর্য প্রতিভার আসল পরিচয় রক্ষিত পায়। অধর দাসকে কি করে তার কারখানার কাজ ছাড়িয়ে রক্ষিত তার নিজের যথার্থ পেশায় ফিরিয়ে আনতে পেরেছে—ইত্যাদি।

এতকিছু শোনা সত্বেও অধর দাসের ডেরায় প্রথম যাকে দেখেছিলাম, মনে হয়েছিল অধর দাস সম্বন্ধে রক্ষিতের অযাচিত আগ্রহের ও উৎসাহের সেই হেতু। সেই রক্ষিতের সোনার খনি।

হয়ত অনুমানে আমার ভুল হয়নি। তবু সম্পূর্ণ সত্যও তা নয়।

দেখেছিলাম অবশ্য তরলাকে। ময়লা রং, দোহারা গড়ন, মুখ চোখ এমন কিছু নিখুঁত নয়, কিন্তু সব কিছু ছাড়িয়ে যেন কালো আগুনের শিখা, পুরুষের পতঙ্গ-প্রাণের কাছে দুর্নিবার যার আকর্ষণ। গরীব দিনমজুরের স্ত্রী, পোষাক-প্রসাধন তারই অনুযায়ী। কিন্তু তরলার মত মেয়ের সম্পর্কে সে সব যেন অবান্তর, এমন কি তার অশিক্ষিত গ্রাম্য কথার টান পর্যন্ত।

হয়ত তরলা নিজের মহিমা জানে। নয়ত আদিম প্রকৃতির স্বাভাবিকতা তার সহজাত। যে হাসি দিয়ে আমাদের সে অভ্যর্থনা করল নিজের মন দিয়ে যে কোন ব্যাখ্যা তার করা যায়।

অধর দাসকেও সেদিন দেখেছিলাম। তরলাকে দেখে যতখানি, তার চেয়ে কম বিস্মিত হয়নি। চেহারা আজীবন হাড়-ভাঙা খাটুনি-খাটা পেট-ভরে-খেতে-না-পাওয়া সাধারণ মজুর মিস্ত্রীর, চোখের দৃষ্টি স্রষ্টা কোন দেবতার। হয়ত আমার মনের ভুল। হয়ত হাতের কাজের কিছু নমুনা দেখবার পর আমার শ্রদ্ধা বিস্ময়ের মোহ

ঘোর আমায় অমন করে তাকে দেখিয়েছে। কিন্তু মুগ্ধ সত্যি হয়েছিলাম। সম্পূর্ণ না হলেও রক্ষিত সম্বন্ধে মনের আগেকার রায় কিছু সংশোধনও করেছিলাম।

তারপর আর কি আছে লেখার? সেই মামুলী ছক। তরলা, রক্ষিত, অধর দাস। মূর্তিমতী কামনার মত একটি মেয়ে, সাধারণ বিবেকের বালাইহীন এক শিল্পী, আর দরিদ্র অশিক্ষিত—

না, অধর দাসকে কিন্তু কোন ছকের মধ্যেই ফেলা যায় না।

সে সব মাপের বাইরে।

সে তখন উন্মাদের মত তার কাজ নিয়েই মেতে আছে। মনে হয়েছে তুলট কাগজ আর তুলির বাইরে কোন দিকে তার চোখ নেই।

কিন্তু রক্ষিতের মত মানুষও যেদিন তার দিকে চোখ তুলে তাকাতে সঙ্কোচ বোধ করেছে সেদিন হঠাৎ তুলি কাগজ সব হেসে তক্তাপোষ থেকে ফেলে দিয়ে অধর দাস বলে উঠেছে—"না, কিছু হবে না আমার রক্ষিতবাবু। ওই কারখানাই আমার ভাল।"

রক্ষিত লজ্জা সঙ্কোচ সব ভুলে গিয়েছে এক নিমেষে।

"বল কি [illegible]! তুমি আবার যাবে কারখানায়? তুমি কি করেছ তা [illegible]জান? তুমি আজই রাজী হও, আমি যেখানে চাও তোমার কাজ দেখাবার ব্যবস্থা করি। দেশ বিদেশের গুণীদের তাক লেগে যাবে। চোখের পলক পড়বে না।"

"তুমি লেখাপড়া-জানা ভদ্দরলোক। বলছ যখন, হবেও বা তাই, কিন্তু তাদের চোখকে ফাঁকি দিয়েও নিজের চোখকে দিতে পারছি কই?"

রক্ষিত অধরের কাজগুলোই তার সামনে উত্তেজিতভাবে মেলে ধরেছে এবার—"ফাঁকি! এই কাজকে তুমি বল ফাঁকি!"

"ফাঁকি, রক্ষিতবাবু সব ফাঁকি। তুমি আমার তুলির টান দেখ,

দেখ আমার রঙের ছোপ। ও'ত আমায় শিখতে হয় না, ও আছে আমার বাপ-পিতম'র থেকে পাওয়া রক্তে। কিন্তু চোখ আমার কই? যা তারা দেখে গিয়েছিল তাই আমি দেখছি তাদের চোখে। তাদের ছুনিয়া আর আমার ছুনিয়া ত এক নয়। আমার নিজের ছুনিয়াকে দেখতে শিখলাম কই?"

রক্ষিত তারপর বোধহয়, শুধু পায়ে ধরে সাধতে বাকী রেখেছে। ফল কিছু হয়নি। অধর নতুন একটি চট-কলে চাকরী নিয়েছে। রক্ষিত তাকে নিজের কাছে এনে রাখতে চাইলে বলেছে—"তুমি বরং তরলাকে নিয়ে যাও রক্ষিতবাবু। ওর প্রাণে অনেক সখ। কিছুই তার মেটেনি।"

রক্ষিত অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়েছে। অধরের চোখে সেই শান্ত সুদূর দেবতার দৃষ্টি।

তারপর অধর একদিন চটকলও ছেড়ে চলে গিয়েছে। যাবার আগে তরলাকে নিজের আঁকা ছবিগুলো দিয়ে বলেছে—"রক্ষিত-বাবুকে দিস। বলিস এ সব তারই আঁকা ছবি, আমি নিমিত্ত মাত্র। তারই ঝড়, আমার ডালপালা শুধু তাতে দুলেছে।"

এতদিন বাদে তরলা কি তার স্বামীকে এক মুহূর্তের বিদ্যুৎ-উদ্ভাসনে চিনেছে! তরলা তার গায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বলেছে—"কোথায় যাবে তুমি আমায় ছেড়ে।"

অধর খানিক চুপ করে থেকেছে, তারপর শান্ত স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলেছে—"কোথায় যাব জানি না, কিন্তু ছাড়তে আমার হবেই,—তোকে, সকলকে। তবে যদি আমার নিজের ছুনিয়াকে দেখবার চোখ আমার ফোটে।"

অধর দাস নিজের ছুনিয়াকে দেখবার চোখ পেয়েছে কিনা কে জানে। সে কিন্তু আর ফেরেনি।

রক্ষিত অনেক দিন অপেক্ষা করেছে, হয়ত আন্তরিক ভাবেই চেয়েছে, অধর ফিরে আস্থক।

কিন্তু মানুষ দুর্বল।

একদিন হঠাৎ রসিক গুণীসমাজ বিস্ময়ে অভিভূত, প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছে রক্ষিতের ছবি দেখে।

রক্ষিতের জয়যাত্রা সেদিন থেকেই শুরু।

স্টোভ

স্টোভটা আর না বাতিল করলে নয়। পাম্প করতে করতে হাতে ব্যথা ধরে যায়। কোন রকমে যদি বা তারপর ধরে তবু থেকে থেকে একটা অদ্ভুত শব্দ করে এমন দপ্ দপ্ করে ওঠে যে, ভয় করে।

সত্যি ভয় করে? বাসন্তীর মনে প্রশ্নটা ঝিলিক দিয়ে উঠতে না উঠতেই স্বামী শশিভূষণ মাঝখানের দরজাটা একটু ফাঁক করে ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা করে, "কি গো এখনো চা হল না? তোমার চা খাওয়াতে ওদের ট্রেন ফেল করিয়ে ছাড়বে নাকি?"

"তা হলই বা ট্রেন ফেল। জলে ত আর পড়েনি। একটা রাত আমরা জায়গা দিতে পারব।"

শশিভূষণ এবার আরও একটু ব্যস্ত ভাবে ঘরেই এসে দাঁড়ায়। "না, না, তুমি বুঝতে পারছ না···"

শশিভূষণকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই বাসন্তী একটু ঝঙ্কার দিয়েই বলে, "বুঝতে খুব পারছি কিন্তু কি করব বল। দুটো বই দশটা হাত ত আর নেই!"

শশিভূষণের এতক্ষণে স্টোভটার দিকে দৃষ্টি পড়ে। অত্যন্ত উদ্বিগ্নভাবে সে বলে, "তুমি আবার এই স্টোভ বার করেছ!"

"বার করব না ত করব কী? একটা উনুনে এত তাড়াতাড়ি সব কিছু হয়?"—শশিভূষণের দিকে চেয়ে তারপর একটু হেসে সে বলে, "তোমার অতিথিকে শুধু চা দিয়ে ত আর বিদেয় করতে পারি না।"

কথাটায় প্রচ্ছন্ন একটু খোঁচা ছিল কি না কে জানে

শশিভূষণের দৃষ্টি কিন্তু তখনও স্টোভটার দিকে। চিন্তিত ভাবে বলে, "স্টোভটা কিন্তু না জ্বালালেই পারতে।"

"আচ্ছা আচ্ছা, তোমাকে অত ভাবতে হবে না। এদিকে তাড়াতাড়িও চাই আবার স্টোভ ধরালেও ভাবনা। যাও তুমি ততক্ষণ গল্প করগে যাও দেখি! আমি এখুনি চা নিয়ে যাচ্ছি।"

"কিন্তু তার আগে আমিই না এসে পারলাম না। আচ্ছা এসব হচ্ছে কী বলুন ত বৌদি?" মল্লিকা এসে বোধ হয় জুতো পায়ে থাকার দরুন চৌকাঠের ওপারেই দাঁড়ায়।

মল্লিকার সঙ্গে আলাপ-পরিচয় অনেক্ষণ হয়েছে, তবু বৌদি ডাকটা একেবারে নতুন। বাসন্তীর উত্তর দিতে তাই বোধহয় একটু দেরি হয়। মল্লিকার দিকে খানিক চেয়ে থেকে সে বলে, "কী আর হচ্ছে ভাই। কিছুই ত পারলাম না।"

মল্লিকা জুতোটা খুলে এবার ঘরেই এসে বাসন্তীর পাশে বসে পড়ে। "আহা শুধু মাটিতে বসলে কেন?" বলে বাসন্তী একটা আসন তাড়াতাড়ি এগিয়ে দেয়।

আসনটা সরিয়ে রেখে মল্লিকা বলে, "থাক, শুধু মাটিতে বসলে আমার মান যাবে না। কিন্তু আপনি যে রীতিমত কুটুম্বিতে শুরু করে দিলেন। তবু যদি নিজে থেকে খোঁজ করে না আসতে হত।"

বাসন্তী স্বামীর দিকে একবার চকিত কটাক্ষ নিক্ষেপ করে বলে, "সে দোষ ত ভাই আমার নয়।"

এতক্ষণ নাগাড়ে পাম্প দেওয়ার পর স্টোভটা ধরে উঠেছে। চায়ের কেতলিটা তার উপর চাপিয়ে দিয়ে বাসন্তী উঠে পড়ে, বলে "আমায় একটু রান্নাঘরে যেতে হচ্ছে ভাই। আপনারা বসে ততক্ষণ গল্প করুন।"

বাসন্তী উঠে চলে যায়। মল্লিকা মাথা নিচু করে বসে থাকে। শশিভূষণ আড়ষ্টভাবে দাঁড়িয়ে থেকে ঠিক কি করা উচিত বুঝতে

পারে না। স্টোভের সাইলেন্সারটাও খারাপ। তার একঘেয়ে কর্কশ শব্দ বেশ একটু অস্বস্তিকর।

মল্লিকা মাথা নিচু করেই হঠাৎ ঈষৎ চাপা গলায় বলে, "এভাবে এসে বোধহয় ভাল করিনি।"

কথাগুলো আরও মৃদুস্বরেই মল্লিকা বুঝি বলতে চেয়েছিল। ষ্টোভের আওয়াজের দরুণ গলাটাকে একটু বেশী চড়াতে হয়। মনে হয়, কথাগুলো যেন উঁচু পর্দায় ওঠার দরুনই খানিকটা মর্যাদা হারায়, কেমন যেন একটু সুলভ হয়ে পড়ে।

"না, না, খারাপ আবার কিসের?" শশিভূষণ কেমন একটু আড়ষ্ট ভাবেই জবাব দেয়। কিন্তু জবাবটা ঠিক এভাবে মল্লিকা আশা করেনি। এবার শশিভূষণের মুখের দিকে চোখ তুলে সে বলে, "কেন যে এতদিন বাদে এ খেয়াল হল নিজেই জানি না, অথচ এই লাইনে আরও দু-তিনবার গেছি। গাড়ি বদলাবার জন্যে স্টেসনে অপেক্ষাও করেছি চার পাঁচ ঘণ্টা। তখনও জানতাম তোমরা এখানেই আছ।"

শশিভূষণ কোন জবাব দেয়না।

স্টোভটা হঠাৎ দপ্ দপ্ করে ওঠে, তারপর আঁচটা কেমন নেমে যায়। বোধ হয় নিজের অজ্ঞাতেই মল্লিকা একটু সরে বসে পাম্প দিতে আরম্ভ করে। স্টোভের শিখাটা বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে কর্কশ আওয়াজটায় সমস্ত ঘর ভরে যায়।

হঠাৎ শশিভূষণ অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে বলে, "আরে আরে করছ কী! অত পাম্প দিও না।"

পাম্পটা থামিয়ে মল্লিকা শশিভূষণের দিকে চেয়ে একটু অবাক হয়েই জিজ্ঞাসা করে, "কেন?"

"মানে, স্টোভটা অনেক দিনের পুরনো, খারাপ হয়ে গেছে। হঠাৎ ফেটে যেতে পারে।"

শশিভূষণের চোখে পরিপূর্ণ স্থির দৃষ্টি রেখে মল্লিকা বলে, "তাহলে ভয়ানক একটা কেলেঙ্কারি হয়,—না ?"

শশিভূষণ কেমন একটু সঙ্কুচিত ভাবে চোখটা সরিয়ে নেয়।

মল্লিকা কিন্তু চোখ না নামিয়েই আবার বলে, "তোমার স্ত্রী মানে বৌদি ত এই স্টোভই জ্বালেন ?"

শশিভূষণ অন্যদিকে চেয়েই বলে, "না, খারাপ হয়ে গেছে বলে এটা ব্যবহারই হয় না। আজ কেন যে বার করেছে কে জানে।"

"ও !" বলে মল্লিকা এবার মাথা নিচু করে খানিকক্ষণ চুপ করে থাকে।

হঠাৎ শশিভূষণ চমকে উঠে বলে, "ও কী, হচ্ছে কী ? বলছি পাম্প দিও না বিপদ হতে পারে।"

স্টোভের আওয়াজের দরুন শশিভূষণকে কথাগুলো বেশ চেঁচিয়েই বলতে হয়। বাসন্তী তখন রান্নাঘর থেকে বড় একটা থালা হাতে নিয়ে দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে, একটু হেসে জিজ্ঞাসা করে, "বিপদ আবার কী হল ?"

মুখ ফিরিয়ে বাসন্তীর দিকে চেয়ে মল্লিকা সকৌতুক হাসির সঙ্গে বলে, "দেখুন ত বৌদি ! আপনার স্টোভে একটু বেশি পাম্প দিলেই নাকি বিপদ হবে ! স্টোভটা কি অতই খারাপ নাকি ?"

বাসন্তী স্বামীর দিকে একবার তাকায়, তারপর রান্নাঘর থেকে আনা গরম খাবারের থালাটা ছোট টেবিলটার উপর রেখে বলে, "খারাপ হতে যাবে কেন ? ওঁর ওই রকম অদ্ভুত ধারণা। একটু পুরনো হলেই বুঝি স্টোভ অচল হয়ে যায় !"

"আমিও তাই বলি।" মল্লিকা সমানে স্টোভটায় পাম্প দিতে থাকে। কেটলির তলা থেকে নীল আগুনের শিখা হিংস্র গর্জন করে চারিধারে যেন ফণা তোলে।

শশিভূষণ কী বলতে গিয়ে যেন বলতে পারে না। কেমন একটু

ভীত অসহায় ভাবে বাসন্তীর দিকে তাকায়। বাসন্তী তবু চুপ করে দাঁড়িয়ে।

হঠাৎ শশিভূষণ ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। বাসন্তী একটু হেসে মল্লিকার পাশে বসে পড়ে, স্টোভটা একটু সরিয়ে নিয়ে বলে, "থাক ভাই থাক, আর দরকার নেই। দু দণ্ডের জন্যে দেখা করতে এসে অত খাট্‌লে আমাদের যে লজ্জা রাখবার জায়গা থাকবে না। আপনি ওঘরে গিয়ে বসুন, আমি এখুনি চা নিয়ে যাচ্ছি। আপনার ভাই বোধ হয় এতক্ষণ একা একা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন।"

মল্লিকা সব কথা শুনতে পায় কিনা কে জানে। হঠাৎ যেন অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে সে বলে, "আপনি বোধহয় ভয় পাচ্ছিলেন যে, স্টোভটা আমি ফাটিয়েই দিলাম।"

"না, ভয় পাব কেন? ফাটবার হলে ও স্টোভ অনেক আগেই ফাটত!" বাসন্তী গলার সুরটা তারপর পাল্টে বলে, "আপনাকে কিন্তু সত্যিই এবার উঠে ওঘরে যেতে হবে। এমনিতেই অতিথি সৎকারের যথেষ্ট ত্রুটি হয়ে গেছে।"

"না, আপনি লৌকিকতার চরম করে ছাড়লেন।" বলে মল্লিকা এবার পাশের ঘরে চলে যায়।

স্টোভের আওয়াজটা পাশের ঘরেও বেশ প্রচণ্ড। তবে একেবারে অত দুঃসহ নয়। মল্লিকার পায়ের শব্দ তাই বোধ হয় শশিভূষণ শুনতে পায় না। একেবারে কাছে গিয়ে দাঁড়াবার পর চমকে মুখ তুলে তাকায়। তারপর কেমন যেন একটু সঙ্কুচিত ভাবে বলে, "তোমার ভাই, আবার একটু ঘুরে বেড়াতে গেল। ট্রেনের সময় হয়ে যাবে বলে ভয় দেখালাম, তবু শুনল না।"

"তা যাকগে। তোমার ভয় নেই। ট্রেন আমরা কিছুতেই ফেল করব না।"

কথাটা কোনরকম ঝাঁজ না দিয়েই মল্লিকা বলে। তারপর

ভূষণের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে না তাকিয়েও পারে না। শশিভূষণ কি এ-কথারও একটা উত্তর দিতে পারে না?

শশিভূষণ কিন্তু নীরবে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে থাকে। মল্লিকার ইচ্ছে হয়, হঠাৎ চিৎকার করে বলে, "তোমার ভয় নেই, ভয় নেই। পাঁচ বছর বাদে আজ হঠাৎ তোমার সংসারে ভাঙন ধরাব বলে আমি আসিনি। তবে আগুন অনেক দিন নিভে গেলেও একটা ছুটো স্ফুলিঙ্গ হয়ত এখনও আছে, নির্লজ্জের মত এই আশাই করেছিলাম।"

এসব কিছুই সে বলে না অবশ্য। নিতান্ত সহজভাবেই সাধারণ আলাপ করবার চেষ্টা করে, "তোমার এখানকার চাকরি ত প্রায় চার বছর হল, না?"

"হ্যাঁ, প্রায় তাই।"

"ভাল লাগে এইরকম মফস্বল শহরে পড়ে থাকতে?"

"না লাগলে উপায় কী? কলকাতার কোন কলেজে চাকরি পাওয়া ত সোজা নয়।"

উপায় কী? ঠিক শশিভূষণেরই যোগ্য উত্তর। এই শশিভূষণের সত্যকার চরিত্র। চিরকাল ভাগ্যের কাছে আগে থাকতে হার মেনে সে বসে আছে। স্রোতের বিরুদ্ধে একটিবার রুখে দাঁড়াবার সাহসও তার নেই। পাঁচ বৎসর আগেও এমনি করেই সে ছুর্বলভাবে নিজেকে ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দিয়েছে। সেদিন এতটুকু দৃঢ়তা তার মধ্যে থাকলে হয়ত তাদের জীবনের ইতিহাস আর এক রকম হতে পারত।

সে-দিনটা এখনও তার ভাল করেই মনে আছে। অনেক ভেবে চিন্তে মিউজিয়মের একটা ঘর তখন তারা পরস্পরের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে ঠিক করে নিয়েছিল। কলেজে দেখা হলেও কথা বলা সমীচীন নয়। তাই সময় ও সুবিধা হলেই একজন আরেকজনের জন্যে এই ঘরটিতে এসে অপেক্ষা করত। মিউজিয়মের সেটা পাথুরে

নমুনার ঘর। তাদের জীবনের অনেক উদ্বেল মুহূর্তের সাক্ষী এই ঘর। বারবার পৃথিবীর নিদারুণ চাপে, বারবার সর্বনাশা প্রলয়ের আগুনে যত মাটি নিষ্পেষিত দগ্ধ হয়ে আশ্চর্য পাথর হয়ে গিয়েছে, গ্রহলোক থেকে যত জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ড তার কঙ্কালাবশেষ পৃথিবীতে ফেলে গিয়েছে, সে-ঘরে তারই নিদর্শন সঞ্চিত।

সেদিন মল্লিকাকে অপেক্ষা করতে হয়েছে অনেকক্ষণ। বিশাল ঘরের সব কটা নিদর্শন দু-তিন বার ঘুরে দেখেও সময় আর ফুরাতে চায়নি। নির্দিষ্ট সময়ের অনেক পরে শশিভূষণ ঘরে ঢুকেছিল। তার মুখ দেখেই মল্লিকার যেন কিছু বুঝতে আর বাকী থাকেনি। তবু সে এ-হতাশাকে আমল দিতে চায়নি।

খানিকক্ষণ কেউই কোন কথা বলেনি। নিঃশব্দে একটু ঘোরবার পর মল্লিকাই আর থাকতে পারেনি। সমস্ত সঙ্কোচ জয় করে নিজেই জিজ্ঞাসা করেছে, "কী বললেন?"

"মা?" শশিভূষণ যেন চমকে গিয়েছে একটু। তারপর একটু চুপ করে থেকে মুখ ফিরিয়ে বলেছে, "মাকে কিছু বলিনি এখনও।"

মল্লিকা স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে একেবারে। শশিভূষণই আবার ক্লান্ত হতাশ স্বরে বলেছে, "মার শরীর খুব খারাপ। আজই দেওঘরে যাচ্ছেন কিছুদিন চেঞ্জের জন্য।"

অনেকক্ষণ, প্রায় যেন একযুগ, স্তব্ধ হয়ে থাকবার পর মল্লিকা অর্ধস্ফুট স্বরে জিজ্ঞাসা করেছে, "তুমি,—তুমিও যাচ্ছ নাকি?"

একটু ইতস্ততঃ করে, শশিভূষণ বলেছে, "মা যেতে বলেছেন। তা ছাড়া—তা ছাড়া ভাবছি, যা কিছু বলার সেখানে বললেই সুবিধে হবে।"

মল্লিকা আর কোন কথা বলেনি। সে যেন বুঝতে পেরেছে সমস্ত প্রশ্নের প্রয়োজন তখনই শেষ হয়ে গিয়েছে।

শশিভূষণই খানিক বাদে বলেছে, "আমি না বললেও বাড়ির সবাই জানে, মাও জানেন।"

এ-কথারও কোন উত্তর দেওয়ার প্রবৃত্তি মল্লিকার হয়নি। একান্তভাবে ছোট একটা উল্কাপিণ্ডের নমুনার দিকে মনোনিবেশ করে সে নিজেকে সংযত করবার চেষ্টা করেছে।

শশিভূষণ আবার বলেছে, অত্যন্ত অপরাধীর মত, "শরীর খারাপের ওপর মা হয়ত বড় বেশী বিচলিত হয়ে উঠবেন, এই ভয়েই এখনও কিছু বলিনি। আমি জানি মাকে আমি শেষ পর্যন্ত বোঝাতে পারব।"

একটা জ্বালাময় উত্তর মল্লিকার বুক থেকে কণ্ঠ পর্যন্ত উথলে উঠেছে। শুধু তোমার মাকে বোঝানটাই কি এত বড়! আমার কি বাড়ি ঘর আত্মীয় সমাজ কিছু নেই? তোমার মার অনুগ্রহের ভিক্ষার ওপরই কি আমার জীবন নির্ভর করছে?

মল্লিকা কিন্তু নিজেকে সংযত করেছে আবার। এবং সেইখানেই বোধ হয় জীবনের চরম ভুল করেছে। শশিভূষণ সেই জাতের মানুষ, নিজের মনকে নিজেই যারা সাহস করে চিনতে চায় না। তাদের পেতে হলে জোর করে আঘাত দিয়ে টেনে নিতে হয়। কী ক্ষতি ছিল সেদিন আর একটু নির্লজ্জ হয়ে শশিভূষণের এই জড়তা ভেঙে চুরমার করে দিলে? সে জানে, সেদিন চেষ্টা করলে শশিভূষণকে সে আর ফিরে না যেতে দিতে পারত। শশিভূষণের নিজের মধ্যে কোন প্রেরণা নেই। কিন্তু ইচ্ছে করলে সমস্ত বাধা, সমস্ত সংস্কারের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার শক্তি মল্লিকাই তার মধ্যে সঞ্চারিত করে দিতে পারত। দেয়নি শুধু নারীসুলভ সঙ্কোচে আর লজ্জায়। আর বুঝি একটু আহত অভিমানে। কী ভুলই সেদিন করেছে!

কিন্তু সত্যি ভুল করেছে কি? চকিতে এ-প্রশ্ন তার মনের সমস্ত দিগন্ত যেন একটা নতুন আলোয় উদ্ভাসিত করে দেয়। এই আত্ম-

বিশ্বাসহীন অসহায় দুর্বল মানুষটির জন্যে গত পাঁচ বছর ধরে প্রতিটি মুহূর্ত সে নিঃশব্দে পুড়ে পুড়ে খাক্ হয়েছে, কিন্তু একে জয় করে নিলে সে কি সত্যি সুখী হত ? ভিজে সলতেয় সারা জীবন ধরে আগুন ধরিয়ে রাখার ব্রত ক্রমশ একদিন দুর্বহ হয়ে উঠত না কি ?

"স্টোভটার আওয়াজটা বড় বিশ্রী শোনাচ্ছে, না ?" শশিভূষণের কথায় মল্লিকার চমক ভাঙে।

অদ্ভুতভাবে হেসে সে বলে, "ভয় হচ্ছে নাকি! কিন্তু বৌদি ত বললেন স্টোভ মোটেই খারাপ নয়।"

কেটলির জল ফুটে উঠে স্টোভের উপর উথলে পড়তেই বাসন্তীর যেন হুঁশ হয়। কেটলিটা নামিয়ে চায়ের পটে জল ঢেলে স্টোভটা নিভিয়ে দেবার জন্যে সে চাবিটার দিকে হাত বাড়ায়। কিন্তু হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে যাওয়ায় চাবি ঘোরান আর হয় না।

সত্যিই কি স্টোভটা আজ হঠাৎ এই মুহূর্তে ফেটে যেতে পারে? ভাগ্যের সঙ্গে এ বাজি খেলবার সাহস তার আছে কি ? একদিন ছিল। সেদিন সত্যিই এই স্টোভটাই সে শেষ মুক্তির পথ বলে ঠিক করে রেখেছিল। কেউ কিছু জানবে না, কিছু বুঝবে না, কোন অপবাদ কারও গায়ে লাগবে না। সবাই জানবে, শুধু একটা দুর্ঘটনা হল।

সেদিন অত বড় নিদারুণ সঙ্কল্প তাকে করতে হয়েছিল শুধু এই মল্লিকার জন্যে, ভাবতে এখন তার আশ্চর্য লাগে। মল্লিকাকে সে চোখে দেখেনি, তার একটা ছবি পর্যন্ত নয়। কিন্তু এ-বাড়িতে প্রথম পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গে শুভানুধ্যায়ীদের কল্যাণে ওই একটি নাম তার দিনরাত্রি বিষাক্ত করে তুলেছে।

মল্লিকাকে সে কী ভাবেই না কল্পনা করেছে। সে-কল্পনার সঙ্গে আজকে এই চাক্ষুষ পরিচয়ের এত তফাত হবে সে ভাবতেও পারে, নি। মল্লিকাকে কুশ্রী বলা চলে না। কিন্তু সে-রূপও তার নেই

যাতে পুরুষের মনে অনির্বাণ আগুন জ্বালিয়ে রাখতে পারে। লেখাপড়া শেখা আধুনিক মেয়ে বলে সাজসজ্জার একটা পরিচ্ছন্নতা আছে, কিন্তু সেই সঙ্গে বয়সের ছাপটাও একেবারে আর লুকনো নেই। স্বামীর সঙ্গে একসঙ্গে কলেজে পড়ত, সুতরাং বয়স নেহাত কম ত হল না।

স্বামীর কাছে মল্লিকার নাম সে বিয়ের পর কোনদিন শোনেনি, কিন্তু আর পাঁচজন হিতৈষী ত আছে সাবধান করবার, পরামর্শ দেবার।

ফুলশয্যার রাত্রেই তাকে সাজিয়ে গুজিয়ে ঘরে পাঠাবার আগে আর সব মেয়েদের উদ্দেশ করে ঠান্‌দি সম্পর্কীয়া প্রৌঢ়া সেকেলে অভদ্র রসিকতা করে বলছিলেন, "ওরে সাজিয়ে ত দিলি, সঙ্গে একটা শিকলি দিয়েছিস ত? নইলে ও উড়ো পাখিকে বাঁধবে কী দিয়ে?"

প্রথমটা কিছু বুঝতে না পেরে শুধু রসিকতার ধরনে বাসন্তী লজ্জায় লাল হয়ে উঠেছিল। কিন্তু বোঝানই যাদের আনন্দ, তারা না বুঝিয়ে ছাড়বে কেন? একটু একটু করে কিছুই তার প্রায় শুনতে বাকী থাকেনি।

স্বামীর মুখে একবার আধবার মল্লিকার নাম শুনলে সে বোধ হয় অতটা আহত হত না, যতটা হয়েছে তাঁর আপাতনির্বিকার নীরবতায়। কতদিন বিছানায় স্বামীকে চুপ করে শুয়ে থাকতে দেখে তার বুকের ভিতরটা জ্বালা করে উঠেছে। হয়ত, হয়ত কেন, নিশ্চয়ই স্বামী, এখন মল্লিকার কথাই ভাবছেন।

মল্লিকাই যদি তোমার দিবারাত্রির ধ্যান ত আমায় বিয়ে করতে গেছলে কেন?—ইতরের মত ঝগড়া করে একথা বলতে পারলে বুঝি খানিকটা বুকের জ্বালা কমত। কিন্তু তার বদলে সে বিছানা ছেড়ে উঠে দরজা খুলে বাইরে চলে গিয়েছে।

শশিভূষণ খিল খোলার শব্দে একটু চমকে জিজ্ঞাসা করেছে, "যাচ্ছ কোথায় ?"

"বাইরে বারান্দায় যাচ্ছি।"

ব্যস্, আর কিছু বলবার দরকার হয়নি। হঠাৎ বারান্দায় যাবার কোন কারণই স্বামী জানতে চান না। তাঁর কোন কৌতূহলই নেই। বাসন্তীর মনে হয়েছে যে, সে যদি বলত, গঙ্গায় ডুবে মরতে যাচ্ছি, তাহলেও স্বামী বোধহয় শুধু একটু 'ও' বলে নিশ্চিন্ত মনে চুপ করে থাকতেন। অসহ্য অসহ্য এই নির্বিকার ঔদাসীন্য, এর চেয়ে সুস্পষ্ট অপমানও ঢের ভাল ছিল।

একদিন এই স্টোভের সামনে বসেই তাই তার মনে হয়েছে, কী ক্ষতি হয় সব একেবারে শেষ করে দিলে। শাশুড়ী তখনও বেঁচে। তাকে স্টোভ জ্বালিয়ে চা করতে দেখে খানিক আগেই তিনি সাবধান করে গিয়েছেন, "ও স্টোভটা তুমি কেন আবার জ্বালতে গেলে বৌমা ? ওটা খারাপ হয়ে গিয়েছে বলে আমি কাউকে ছুঁতেই দিই না। দেখো বাপু, ফেটে টেটে আবার একটা কেলেঙ্কারি না হয়।"

ফেটে গিয়ে কেলেঙ্কারি! হ্যাঁ, এরকম দুর্ঘটনা খুব নতুন নয়। বাসন্তী প্রাণপণে স্টোভটায় পাম্প দিয়েছে। কোন দুর্ঘটনাই কিন্তু ঘটেনি।

তারপর ধীরে ধীরে কবে থেকে যে সব বদলে গিয়েছে, বাসন্তী ঠিক স্মরণ করতেই পারে না। কিন্তু ক্রমশই তার মনে হয়েছে, এই একান্ত অসহায় পরনির্ভর মানুষটি, এক পা যে তার সাহায্য বিনা চলতে পারে না, নিজের অসুখটা পর্যন্ত যার বাসন্তীর কাছে জেনে নিতে হয়, গভীর কোন ভালবাসা তার মনে চিরন্তন হয়ে আছে, এ কি বিশ্বাস করবার যোগ্য ? যার মনের হৃদয়ের সমস্ত ব্যাপার আজ বাসন্তীর কাছে জলের মত স্বচ্ছ, এমন কোন আশ্চর্য গোপন স্থান

তার কোথাও কি থাকতে পারে, যেখানে অত বড় ভালবাসা নিঃশব্দে গোপন করে রাখা যায়! কোনদিন কোন রঙ যদি শশিভূষণের মনে লেগে থাকে, বাসন্তী স্থির বিশ্বাসে জানে যে, সে-রঙ অনেক আগেই ধুয়ে মুছে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে।

একদিন সে নিজেই তাই মল্লিকার কথা তুলেছে স্বামীর কাছে। "ওগো, এখানকার গোকুলপুরের মেয়েদের স্কুলে নতুন কে হেড্-মিস্ট্রেস হয়েছেন জান? তোমাদের সেই মল্লিকা রায়।"

মল্লিকা সম্বন্ধে স্বামীস্ত্রীর মধ্যে আলাপ এই প্রথম। তবু বাসন্তীর কথায় বা কথার ধরনে শশিভূষণের কোন ভাবান্তরই চোখে পড়ে না। নিতান্ত স্বাভাবিক ভাবেই সে বলে, "হ্যাঁ, শুনেছি।"

এতটা নির্লিপ্ততা বুঝি বাসন্তীও আশা করেনি। সে আবার একটু খোঁচা দেবার জন্যেই বলেছে, "আমাদের এই জংশন স্টেশনেই ত গাড়ি বদল করে যেতে হয়। একবার আসতে বল না কেন?"

"কী জন্যে?" শশিভূষণ যেন একটু অবাক হয়েই জিজ্ঞাসা করেছে।

"কী জন্যে আবার! একবার একটু দেখতাম।" বলে বাসন্তী সেখান থেকে চলে গিয়েছে।

শশিভূষণ আসতে অবশ্য বলেনি। মল্লিকা আজ এতদিন বাদে নিজে থেকেই এসেছে। না, সত্যিই কোন জ্বালা, কোন সংশয় বাসন্তীর মনে আর নেই। সে বরং খুশী হয়েছে মনে মনে। তার এই পরিপূর্ণ সৌভাগ্যের দিনই মল্লিকাকে সে এনে দেখাতে চেয়েছিল। যত জ্বালা সে এতদিন পেয়েছে, এ যেন তারই ঋণ শোধ।

ওঘরে বসে এখনো ওরা গল্প করছে। কী গল্প করছে কে জানে? যা-ই করুক, কিছু আসে যায় না। বাসন্তী জানে, তার কোন ভয় আর নেই।

ঠিক এই মুহূর্তে স্টোভটা কি ফেটে যেতে পারে ?

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে যাওয়ায় বাসন্তী চমকে ওঠে। কী ভাববে তাহলে মল্লিকা ? কী ভুল ধারণাই না সে করতে পারে ! অনায়াসেই ভাবতে পারে, এই নিদারুণ নাটকীয় পরিণামের সে-ই বুঝি মূল। বুঝি সে আসাতেই বহুদিনের নিরুদ্ধ বেদনার এই আত্মঘাতী বিস্ফোরণ !

না, না, এ মিথ্যে গৌরবের সুযোগ কিছুতেই মল্লিকাকে দেওয়া যায় না। স্টোভটা নেভাবার জন্যে বাসন্তী চাবিটাকে ঘোরাতে যায়। হঠাৎ চাবিটা এত এঁটে গেলই বা কী করে ? বাসন্তী সমস্ত শক্তি দিয়েও সেটা ঘোরাতে পারে না। হঠাৎ ভয় পেয়ে তার মনে হয় শশিভূষণকে ডাকবে কিনা ! কিন্তু না, সে বড় লজ্জার ব্যাপার। তা হলেও মল্লিকার কাছে মান থাকে না।

স্টোভটা কিন্তু সত্যি যেন উন্মাদের মত হিংস্র গর্জন করছে। উঠে কোথাও সরে যাবার কথাও বাসন্তী ভাবতে পারে না। প্রাণপণ শক্তিতে সে চাবিটা খোলবার চেষ্টা করে। কিছুতেই— আজ কোন দুর্ঘটনা যে ঘটতে দেওয়া যায় না।

জ্বর

সন্ধ্যে সাতটায় কম্প দিয়ে জ্বর এল।

লেপ কাঁথা যেখানে যা ছিল চাপা দিয়েও সে-কাঁপুনি থামান যায় না। একটা প্রচণ্ড উন্মত্ত আলোড়ন শুধু যেন শরীর নয়, সমগ্র সত্তার অন্তঃস্থল থেকে উদ্দাম হিমশীতল তরঙ্গের পর তরঙ্গ সমস্ত চেতনা ক্ষণে ক্ষণে আঘাতে আঘাতে জর্জরিত প্লাবিত করে দিয়ে যাচ্ছে।

এক মুহূর্তে সব কিছু গেল বদলে। কোন ধারাবাহিকতা আর নেই চেতনার।

জীবনের একটি নিটোল চমৎকার দিন যেন টুকরো টুকরো হয়ে, ভেঙে ছড়িয়ে, এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে মিশে।

শেড-দেওয়া আলোয় প্রায়ান্ধকার একটি ঘর ক্রমশ যেন সঙ্কীর্ণ হয়ে আসছে। নমিতার একটা ঠাণ্ডা হাত মাথার উপর থেকে বহুদূর যাচ্ছে সরে। দেওয়ালে অদ্ভুত সব ছায়ার নক্‌শা যেন জীবন্ত হয়ে চলাফেরা করছে। উড়ে যাওয়া মেঘের মত একটা মশারির চাল হঠাৎ মুখের উপর এল নেমে। পাশের বাড়ির কর্কশ রেডিও-নিনাদ, ওধারে বারান্দায় কাদের আলাপ হয়ে উঠল।

তারই মধ্যে বয়ে যাচ্ছে আশ্চর্য ঠাণ্ডা এক নদী, স্টীমারের মৃদু একটু কম্পন, নেপথ্যে প্রপেলারের একটা একঘেয়ে আওয়াজ, রেলিংএর উপর দিয়ে ঝুঁকে পড়া একটি মুখ,—স্নিগ্ধ, পরিচ্ছন্ন তবু কেমন যেন একটু কঠিন।

বারান্দায় ওরা আমারই কথা আলাপ করছে মনে হয়।

"আর দুদিন সবুর করলে কী এমন রাজ্যনাশ হত! এই শরীরে আজকালকার পথের এত ধকল সহ্য হয়?"

পথের ধকল? হ্যাঁ, ধকল কম নয় বটে। স্টীমার-ঘাটে সেই জনসমুদ্রের দিকে চেয়ে সত্যি আতঙ্ক হয়েছিল। মনে হয়েছিল স্টীমারে সাতদিন অপেক্ষা করেও পৌছতে পারব না। এত মানুষ কখনও একটা স্টীমারে ধরতে পারে! গ্যাং-ওয়েটা যেন মানুষের ভারে ভেঙে পড়বে। হরেক রকম মানুষের একটা জমাট জটলা। কুলি, ভদ্রলোক, ফৌজ, তারই সঙ্গে বিচিত্র বিপুল মালপত্রের লট-বহর।

...মাথার ভেতর একটা ঠাণ্ডা স্রোত যেন ধীরে ধীরে নামছে। নমিতাই বুঝি আইস-ব্যাগটা ধরে আছে। কোথায় কারা বাজার-দর নিয়ে আলাপ করছে।

"আগুন! আগুন! যা কিছু ছুঁতে যাও সব আগুন।"

"আর বারে গেছে চাষী-মজুর, এবার আমাদের পালা।"

"সুস্থ লোকের খাবার নেই, ত রোগীর ওষুধ।"

"তবু কলকাতায় কী রকম ভিড় দেখেছ—বেড়েই চলেছে।"

...উপরের ডেকে উঠবার সিঁড়িটার কাছে কেমন করে পৌছে ছিলাম, নিজেই জানি না। নিজের ইচ্ছায় অনিচ্ছায় নয়, সমবেত জনতার একটা নিরবচ্ছিন্ন চাপে শুধু এগিয়ে চলেছি।

সিঁড়ির উপরের ডেকের ফোকরটা যেন একটা হাঁ-করা বিভীষিকা। কুলিদের মাথার মালগুলো বিপজ্জনকভাবে কাত হয়ে আছে। উপরে মানুষের নিরেট দেওয়াল ভেদ করে কোন দিন উঠতে পারব মনে হয় না। দুঃসহ দমবন্ধ করা গরম, তারই মধ্যে হঠাৎ চারিধারের কোলাহলটা যেন আরও তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল।

অর্ধসচেতনভাবে বুঝতে পারলাম সমূহ বিপদ ঘনিয়ে এসেছে।

সিঁড়ির উপরের ধাপের একটা কুলির মাথার উপরকার মালের পাহাড় টলে গিয়ে ধসে পড়বার উপক্রম।

সরে যাবার জায়গা নেই, দুর্বল হাতে সেই বিশাল সুটকেশ ট্রাঙ্কের পাহাড়ের পতন নিবারণ করা অসম্ভব। অভিভূতের মত নিশ্চেষ্টভাবে শুধু সেটি ঘাড়ের উপর পড়বার প্রতীক্ষায় আছি, আচ্ছন্নভাবে পিছনে অনেকের কলরবের মধ্যে নারী-কণ্ঠের একটা চিৎকার শুনলাম। আপনা হতে একবার চকিতে মুখটা পিছন দিকে ঘুরে গেল। একটি অদ্ভুত কম্পিত মুহূর্ত···আতঙ্ক···বিস্ময়···কেমন একটু অস্বস্তি।

পরমুহূর্তে কোলাহলের তীক্ষ্ণতা আবার স্বাভাবিক খাদে নেমে এল, মালের পাহাড় কেমন করে যেন আপনা থেকেই দৈববলে সামলে গিয়েছে, নিরেট দেওয়ালে একটা ফাঁক দেখা দিয়েছে।

সুটকেশটা কোন রকমে টেনে নিয়ে উপরে গিয়ে উঠলাম।

উপরেও সেই জনসমুদ্র। তিলধারণের জায়গা নেই। সুটকেশটা কোনরকমে পেতে বসবার একটা ফাঁক খোঁজবার জন্যে হতাশ ভাবে চারিধারে তাকাচ্ছি। পিছন থেকে আবার শুনলাম, "ওখানে দাঁড়িয়ে কেন, সেকেণ্ড ক্লাস কেবিন এদিকে।"

যিনি এ-সম্ভাষণ করলেন তাঁর মুখের দিকে ফিরে তাকালাম। মুখ থেকে তাঁকে, পোশাক থেকে তাঁর সঙ্গের মালপত্র, মালপত্র থেকে দাসীর কোলে ঘুমন্ত শিশু, ঘুমন্ত শিশু থেকে উর্দি-পরা চাপরাশীর চেহারা পর্যন্ত সব কিছুর উপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে হঠাৎ হেসে বললাম, "চল।"

···হিম-শীতল তরঙ্গের সে প্রচণ্ড আলোড়ন থেমে গিয়ে একটা গাঢ় আচ্ছন্নতা নেমে এসেছে নিশ্ছিদ্র মেঘপুঞ্জে ঢাকা আকাশের মত।

নমিতা কোথায় ছেলেদের গোলমাল করবার জন্যে শাসন করছে শুনতে পাচ্ছি। সঙ্কীর্ণ এই দুখানি মাত্র ঘর, ছেলেরা কোথায় বা যায়। ছেলেদের গোলমালের চেয়ে পাশের বাড়ির রেডিওটা যদি কেউ থামিয়ে দিতে পারত! আর বারান্দায় ওই অবিশ্রান্ত আলাপ!

"রাস্তায় ঘাটে সত্যই ত পয়সা ছড়ান, কিন্তু কুড়িয়ে নেবারও তাকত চাই।"

"নেহাত হতভাগা না হলে আজকের দিনে কেউ আর বেকার নেই।"

"মানুষ হলে কেউ স্কুল-মাষ্টারি করে আজকের দিনে? তার চেয়ে রিক্‌শা টানলেও অনেক বেশী লাভ।"

কাকে উদ্দেশ করে যে আলাপ চলেছে তা বোঝা কঠিন নয়।

কোথা থেকে বিরামহীন একটা জল পড়ার আওয়াজ আসছে।

পাশের বাড়ির ট্যাঙ্ক ছাপিয়ে জল পড়ছে বোধহয়। শুধু এই জলের নিরবচ্ছিন্ন স্নিগ্ধ শব্দটি যদি শুনতে পেতাম ··!

স্টীমারে কেবিন একটিও খালি নেই। রিজার্ভ করার প্রমাণ স্বরূপ কাগজখানা মূল্যহীন। সে-কাগজ দেখিয়ে ঝগড়া করবার মতও কাউকে পাওয়া যায় না। সময় বুঝে কেবিন-ক্লার্ক গা ঢাকা দিয়েছে। স্টীমারের জনসমুদ্রে কোথায় তাকে খুঁজে বার করা যাবে?

কেবিনগুলোর সামনে রেলিংএর ধারে একটু জায়গা করে মাল-পত্রগুলো জমা করে রাখা হয়েছে। সৌভাগ্যক্রমে একটা বেঞ্চি পাওয়া গেছে বসবার মত।

"কিন্তু এ কী চেহারা হয়েছে তোমার বল ত!"

"খুব খারাপ হয়েছে নাকি!"

"চেনাই যায় না।"

হেসে বললাম, "চেনা নিশ্চয় যায়। নইলে চিনলে কী করে ?"

"তুমি ত চিনেও এড়িয়ে যাবার মতলবে ছিলে।"

বেঞ্চিরই একধারে শায়িত ঘুমন্ত শিশুটির ওপর থেকে চাপরাশী পর্যন্ত সব কিছুর উপর আর একবার চোখ বুলিয়ে বললাম, "সেটা কি খুব অন্যায় ?"

বেশ কিছুক্ষণের নিস্তব্ধতার পর উত্তর এল, "হ্যাঁ, সত্যি-ই অন্যায় !"

একটু বিস্মিত হয়েই তার মুখের দিকে তাকালাম। দুজনের পরিচয়ের ইতিহাসে যেখানে ছেদ পড়েছিল, তার পরের কোন কথাই কেউ এ পর্যন্ত তুলিনি। শুধু এইটুকু জেনেছি যে, শর্মিষ্ঠার স্বামী বেশ বড় দরের একজন সরকারী কর্মচারী ; সম্প্রতি বদলি হয়ে যেখানে গিয়েছেন, শর্মিষ্ঠা পিত্রালয় থেকে শিশু-কন্যাকে নিয়ে সেখানেই রওনা হয়েছে। এতক্ষণ যে-ধরনের অবান্তর আলাপ চলেছে তার মাঝখানে শুধু এই মন্তব্যটুকু নয়, তা বলবার ভঙ্গিটি পর্যন্ত কেমন যেন বিসদৃশ লাগল তাই।

আমার বিস্মিত দৃষ্টিটুকু লক্ষ্য করেই বোধহয় শর্মিষ্ঠা খানিকটা মাথা নিচু করে রইল একটু যেন অপ্রস্তুত ভাবে। তারপর মৃদুস্বরে বললে, "আমার কথা তুমি বুঝতে পারলে না ?"

সরল ভাবে বললাম, "না।"

আরও বেশ খানিক্ষণ চুপ করে থেকে শর্মিষ্ঠা ধীরে ধীরে বললে, "জীবনটা ঠিক নিপুণ লেখকের সাজানো গল্প ত নয়—একটি মাত্র জুতসই সমাপ্তি যার লক্ষ্য, সুখ বা দুঃখের একটি বিশেষ রসসৃষ্টি করেই যার ধারা যায় ফুরিয়ে।"

একটু হেসে বললাম, "নিপুণ লেখকের মতই বড্ড বড় কথা বলার চেষ্টা করছ নাকি !"

"সত্যিই বড় কথা ভাগ্য যখন ভাবিয়েছে তখন বললে দোষ কী ?"

মনে পড়ল শর্মিষ্ঠা চিরদিনই একটু বেশী বড় কথা ভাবত। নিজের মাপের চেয়েও বড়। ভাগ্য তাকে বড় কথা যদি ভাবিয়ে থাকে, তার মাপের চেয়ে বড় জায়গায় টেনেও তুলেছে। এবার নিজের অনিচ্ছাতেই একটু খোঁচা না দিয়ে পারলাম না।

বললাম, "প্রচুর অবসর আর স্বাচ্ছন্দ্য থাকলে এসব বিলাস সাজে।"

শর্মিষ্ঠা কিন্তু অবিচলিত ভাবেই নিজের কথার জের টেনে বললে "যা হারাই তা মনে করে রাখার অনির্বাণ বেদনা হল বইএর গল্পের, জীবনে তার পরেও কিছু থাকে।"

"কী থাকে ?"

"যা পেয়েছিলাম তাই মনে রাখার প্রশান্তি।"

শর্মিষ্ঠার দিকে আর একবার সবিস্ময়ে তাকালাম। তার পোশাক থেকে প্রসাধনের পরিচ্ছন্ন বিশেষত্বে, তার সহজ আত্মস্থ ভঙ্গিতে বোধ হয় প্রশান্তিরই পরিচয়।

…বারান্দার আলাপের সুর এখন চড়া। নমিতার সঙ্কুচিত স্বর এই আচ্ছন্নতার ভিতর ভাল করে কানে পৌঁছচ্ছে না, কিন্তু তার মর্মটা অস্পষ্ট নয়।

"বরফ ! আর বরফ পাওয়া যাবে কোথায় ! আড়াই টাকা সের বরফ দশ-বিশ সের কিনতে কত টাকা লাগে হিসাব আছে ? আর টাকা থাকলেই কি বরফ পাওয়া যায় ?"

কণ্ঠস্বরটা আমার শ্বশুর মশাইএর। অকর্মণ্য অক্ষম এক জামাইএর হাতে কন্যাদান করার ভুলের জন্য নিজেকে তিনি এখনও ক্ষমা

করতে পারেননি। তাঁর অনুশোচনা নানাভাবে নানাভঙ্গিতে তাই প্রকাশ পায়।

নমিতার মৃদু কণ্ঠের মিনতির ভাষাটা পাশের বাড়ির রেডিও-নিনাদে হারিয়ে গেল। শ্বশুর মশাইএর কণ্ঠ আবার রেডিও ছাপিয়ে উঠল, "কাজ ত হল অষ্টরম্ভা! লাভের মধ্যে খাস জংলী ম্যালেরিয়াটি বাগিয়ে নিয়ে এলেন। এমন কাজের খোঁজে সাত তাড়াতাড়ি যাবার দরকার কী ছিল। বরাতে ত সেই স্কুল-মাষ্টারি।"

পাশের বাড়ির রেডিওটা সত্যিই বুঝি পাল্লা দিতে না পেরে হঠাৎ থেমে গিয়েছে। শুধু ছাপিয়ে ওঠা ট্যাঙ্ক থেকে ঝির-ঝির করে জল পড়ার একটা আওয়াজ। সে-জলের ঠাণ্ডা শব্দ যেন কানের ভিতর দিয়ে শরীরের সমস্ত শিরায় শিরায় পেতে চাই।

নমিতা কাছে এসে দাঁড়িয়েছে, টের পাচ্ছি। আইস-ব্যাগটা একবার মাথার উপর ধরে নামিয়ে নিলে। আইস-ব্যাগে বরফ আর নেই, সব জল হয়ে গিয়েছে।

চোখ না খুলেই নমিতার মুখ যেন আমি দেখতে পাচ্ছি। লেপের ভিতর থেকে হাতটা বার করে তার হাতটা ধরে ফেললাম। ভিজে ঠাণ্ডা স্পঞ্জের মত নিষ্প্রাণ হাত—অনেকক্ষণ আইস-ব্যাগ ধরে থাকার দরুন বোধ হয়।

আস্তে আস্তে বললাম, "আমার কোটটার ভেতরের পকেটটা খুঁজে দেখ নমিতা, টাকা আছে।"

"টাকা আছে!" নমিতার কণ্ঠস্বরে গভীর বিস্ময়। জ্বরের ঘোরে প্রলাপ না সত্যি বলছি সে বুঝতে পারছে না।

...অনেক কষ্টে শেষ পর্যন্ত কেবিন-ক্লার্কের সন্ধান পাওয়া গেল একটা কেবিনের ব্যবস্থা হতে পারে—তবে কিঞ্চিৎ উপরি লাগবে।

আমাকে ইতস্তত করবার অবসর পর্যন্ত না দিয়ে শর্মিষ্ঠা মনিব্যাগটা বার করে আমার হাতে তুলে দিলে।

স্বাভাবিক সঙ্কোচে বললাম, "তুমি গুনে দাও না ?"

"না না ; তোমার কাছে থাক না এখন। যাও যাও হ্যাঙ্গামা চুকিয়ে দিয়ে এস।"

হ্যাঙ্গামা চুকিয়ে দিয়ে এসে দেখলাম শর্মিষ্ঠা কেবিনটি দখল করে ইতিমধ্যেই চাপরাশীর সাহায্যে মালপত্র তুলে সব গোছগাছ করে নিয়েছে।

গোছগাছ একটু বেশী রকম। হেসে বললাম, "তুমি ত একেবারে সংসার পেতে বসেছ দেখছি, অথচ একঘণ্টা বাদেই ত নেমে যাবে।"

টিফিন কেরিয়ার থেকে দুটি প্লেটে খাবার সাজাতে সাজাতে শর্মিষ্ঠা বললে, "এক ঘণ্টার সংসারই কি তুচ্ছ—ঘণ্টা ধরে ত সব কিছুর দাম কষা যায় না।"

খাবারের প্লেটটা আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে আমায় বললে, "নাও, এবার একটু নিশ্চিন্ত হয়ে তোমার সব কথা শুনব।"

ভাবলাম বলি—আমার কথা শোনার ধৈর্য কি তোমার আছে শর্মিষ্ঠা ? যেখানে আমাদের পরিচয় হয়েছিল, সেখান থেকে আমি অনেক ধাপ নেমে এসেছি, তুমি গেছ উঠে। আমি দরিদ্র স্কুল-মাষ্টার, ব্রত বড়, নিষ্ঠা নেই। যুদ্ধের বাজারে আগুন যেখানেই লাগুক, ছাই হল আমাদের সংসার সবার আগে। তাই আজকের দিনে আলাদীনের প্রদীপ যাদের হাতে তাদের একজনের দরজায় লোভে, দুরাশায় ধন্না দিতে গেছলাম। কিন্তু তাও ভাগ্যে সইল না। জ্বরে পড়ে রুগ্‌ণদেহ নিয়ে পুনর্মূষিক হয়ে ঘরে ফিরছি। তুমি আমার জীবনে কবে কী ছিলে তা মনে রাখবার উৎসাহটুকুও আমার নেই !

কিছুই কিন্তু বললাম না—বলবার দরকার হল না। শর্মিষ্ঠার নিজেরই দেখা গেল এত কথা বলবার আছে যে, সময়ে কুলোয় না, —তার জীবনের গভীর সূক্ষ্ম সব দুঃখ, আঘাত, দ্বন্দ্ব, সমস্যার কথা। সেই সঙ্গে তাদের পারিবারিক প্রসঙ্গও বুঝি না এসে পারে না, তার স্বামীর পদমর্যাদা, দায়িত্ব, তাদের সাংসারিক সামাজিক প্রতিষ্ঠার পটভূমিকায় শর্মিষ্ঠা নিজের হৃদয়কে যেন সবিস্তারে বিশ্লেষণ করে চলল।

অবহিত হয়ে তার কথাই শুনছিলাম। প্লেট খালি দেখে শর্মিষ্ঠা আবার অনেকগুলো খাবার চাপিয়ে দিলে। বললাম, "করছ কী! কত আর দেবে।"

শর্মিষ্ঠা গাঢ় গভীর স্বরে বললে, "আমার কাছে কতবড় পাওনা তোমার ছিল, তার কী-ই বা দিতে পারলাম।"

…বারান্দায় শ্বশুরমশায়ের গলার স্বরটা হঠাৎ কেমন নূতন শোনাচ্ছে।

"এ-ত একশ টাকার নোট, এখন ভাঙাব কোথায়?"

নমিতার কণ্ঠস্বর এবার আর ভত মৃদু নয়, "সব কটাই ত ওই!"

"সব কটাই! ওঃ—এতক্ষণে বুঝেছি, কিছু কাজ সেখানে নির্ঘাত বাগিয়েছে!"

মাঝখানের একটা স্টেশনে শর্মিষ্ঠা নেমে গেল। যথাসম্ভব সাহায্য করলাম—কুলি ডেকে মালপত্র নামাবার ব্যবস্থা করে দিয়ে।

স্টীমার ছাড়বার আগে পর্যন্ত শর্মিষ্ঠা পণ্টুনে রইল দাঁড়িয়ে। শেষ মুহূর্তে গভীর গাঢ় স্বরে বললে, "আমি কী ভাবছি জান?"

"কী ?"

"আর যেন দেখা না হয়।"

একটু চুপ করে থেকে পকেট থেকে তাড়াতাড়ি তার মনিব্যাগটা বার করে ছুঁড়ে দিলাম।

"দেখ দিকি, আর একটু হলে ভুলে যাচ্ছিলাম।"

"শেষকালে শুধু কি ওইটুকুই মনে পড়ল !"

একটু হাসলাম, উপরে ঘণ্টা বাজছে স্টীমার চালাবার। প্যাডলের আলোড়নে স্টীমার কাঁপছে।

শর্মিষ্ঠা কখন ব্যাগ খুলবে জানি না, খুললে আমার চিঠির টুক্‌রোটুকু পাবে নিশ্চয়। লিখেছি, "তোমার কাছে অনেক বড় পাওনা আমার ছিল, তার সামান্য কিছু শোধ নিলাম।"

চিরদিনের ইতিহাস

নিরিবিলি দেখে হনু একটু নিশ্চিন্ত হয়ে গা চুলকোবার যোগাড় করছে, এমন সময়ে উপরে আওয়াজ হল—"হুম্; হুম্!" দিনদুপুর হলে কী হয়—জায়গাটা বেজায় অন্ধকার, তাই হনু প্রথমটা দেখতে পায়নি। এবার চমকে এদিক-ওদিক চেয়েই উর্ধ্বশ্বাসে দে লাফ। এ-ডাল থেকে আর-ড়ালে, সে-ডাল থেকে একেবারে আর-এক গাছে। ওঃ, খুব ফাঁড়াটা কেটে গিয়েছে। আর একটু হলেই হয়েছিল আর কি! গেছোপ্যাঁচার অক্ষয় পরমায়ু হক, দিনকানা বলে আর কখনও তাকে হনু খেপাবে না।

শিকার ফসকে চিতা চকচকে ছুরির মত চোখ তুলে একবার গেছোপ্যাঁচার দিকে তাকালে। ডালটা নাগালে পেলে একবার চুকলি খাওয়ার মজাটা দেখিয়ে দিত।

কিন্তু গেছোপ্যাঁচা হুতুম নির্বিকার—ধ্যানগম্ভীর বুদ্ধমূর্তি যেন। আধবোজা চোখের তলা দিয়ে চিতার দিকে শান্ত ভাবে তাকিয়ে বললে, "কাজটা কি ভাল হচ্ছিল বন্ধু—বিশেষ এই দিনদুপুর বেলা?"

চিতা নীচে থেকে ফ্যাঁস করে উঠল, "দিনদুপুর বেলা মানে?" হুতুম গম্ভীর ভাবে বললে, "মানে আজকাল তোমরা বনের শাস্তরটাস্তর সব উল্টে দিলে কিনা! দিন রাতের বিচার আর নেই। অথচ তোমার ঠাকুরদা চাঁদনী রাতে পর্যন্ত রক্তপাত করত না।"

চিতা চটে উঠে গা ঝাড়া দিয়ে বললে, "রেখে দাও তোমার ও সব শাস্তর। শাস্তর মানবার জন্যে উপোস করে মরতে হবে নাকি!

ঠাকুরদা শাস্তর মানবে না কেন! তাদের ত আর আমার মত সাত সন্ধ্যে নিরস্তু উপোস করতে হত না, ক্ষিদেয় পেট পিঠ একও হয়ে যেত না। তখন থাবা বাড়ালে কিছু না হক একটা খরগোশ ত মিলত।"

হুতুম চোখ বুঁজেই বললে, "এত অধর্ম ছিল না বলেই মিলত।"

চিতা চটে কাঁই হয়ে উঠছিল ক্রমশ। চুকলি খাবার পর গেছোপ্যাঁচার এই ভণ্ডামি অসহ্য। কিন্তু ডালটা নেহাত উঁচু আর পলকা বলেই তাকে এবার একটা হাই তুলে সরে পড়তে হল। যাবার সময় শুধু একবার বলে গেল, "দিনের চোখ গেছে, রাতের চোখও যাক তোর।"

হুতুম কিছুই গায়ে না মেখে শুধু বললে, "হুম।"

খানিক বাদে আবার সাবধানে এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে হনু এসে হাজির। মৌতাতে গেছোপ্যাঁচার চোখ তখন আবার বুজে আসছে।

হনু বললে, "দেখলে দাদা চিতার নেমকহারামিটা! তুমি না থাকলে ত সাবড়েই দিয়েছিল!"

হুতুম বাজে কথা বেশী কয় না, বললে, "হুম্।"

হনুর একটু বেশী কিচির-মিচির করা স্বভাব। সে বলেই চলল, "অথচ এই আর-অমাবস্যায় ওর কী উপকারটা না করেছি? বারশিঙার জলায় মাছের লোভে গিয়েছিলেন। এদিকে বুড়ো ময়াল যে কাচ্চা-বাচ্চা সমেত ওইখানেই আড্ডা গেড়েছে সে-খবর ত রাখেন না। জামগাছ থেকে সাবধান না করলে সেই রাতেই হয়ে গিয়েছিল আর কি!"

হুতুমের কাছে কোন উত্তর না পেয়ে হনু আবার বললে, "আমিই প্রাণ বাঁচালাম আর আমাকেই কিনা তাগ!"

হুতুম এবার চোখ খুলে তাকিয়ে গম্ভীরভাবে বললে, "এ ত আর নতুন দেখছিস না বাপু! ও জাতের ধারাই ত এই। থাবায় যারা নখ লুকোয় তাদের আবার বিশ্বাস করে নাকি? হুম্!"

হনু পিঠ চুলকে বললে, "কিন্তু কী করা যায় বল ত দাদা! বনে ত আর টিকতে দিলে না। এক দণ্ড স্বস্তি যদি থাকে! একা রামে রক্ষা নেই সুগ্রীব দোসর! গাছে চিতা, নীচে কেঁদো; দাঁড়াই কোথায়?"

হুতুম বললে, "হুম্।"

হনু হতাশভাবে বললে, "একটা উপায় বাতলাতে পার না হুতুমদা! তোমার এমন মাথা!"

মাথার প্রশংসায় একটু খুশি হয়ে হুতুম বললে, "উপায় আছে, কিন্তু পারবি কি?"

"পারব না! খুব পারব। শুধু একা আমার নয় ত, বনের সবাই অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। এই ত কাল কেঁদো বাগে পেয়ে কাকিনীর দফা রফা করেছে। বয়ার ত রেগে আগুন হয়ে গেছে; ঘুরে বেড়াচ্ছে বুনো মোষের পাল নিয়ে। একবার সুবিধে পেলে হয়।"

হুতুম তাচ্ছিল্যভাবে বললে, "ও সব চারপেয়ের কর্ম নয়।"

হনু হুতুমের এই দুর্বলতাটুকু জানে। হুতুম আর সব দিকে খুব বিজ্ঞ খুব ধীর; কিন্তু মানুষের মত দু পায়ে হাঁটে বলে সেও যে মানুষের জ্ঞাতি, তার এই ধারণার বিরুদ্ধে কিছু বললে আর রক্ষা নেই।

হনু নরম হয়ে তোষামোদ করে বললে, "দু-পেয়ে বলেই না তোমার কাছে আসি পরামর্শের জন্য।"

হুতুম খুশী হয়ে বললে, "তবে শোন্।" কিন্তু কথা আর কিছু হল না। দূরের মাদার গাছের ডালের উপর বুঝি একটা কেন্নোর মত

পোকা একটুখানি উঁকি মেরেছিল। শোঁ করে একটা শব্দ হল ; তারপরেই দেখা গেল হুতুম উড়ে গিয়েছে সেখানে।

হনু খানিক অপেক্ষা করল, কিন্তু হুতুমের আর দেখা নেই। পোকার খোঁজে সে তখন ডাল ঠোকরাতে ব্যস্ত। আর তার আশা নেই বুঝে হনু খানিক বাদে সরে পড়ল। হুতুমের মরজির খবর সে রাখে।

তরঙ্গিয়ার জঙ্গলে সত্যিই বড় গোলমাল। অবশ্য জঙ্গলে আর শান্তি কবে মেলে ? জঙ্গলের বাসিন্দারাও সে-কথা জানে না এমন নয়, তবু এত উপদ্রব তারা কখনও ভোগ করেনি। বনের ঘুপসি অন্ধকারে বসে শলা-পরামর্শ হয়, শোনা যায় হা-হুতাশ, কিন্তু সব চুপিচুপি। কোথায় কেঁদো আছে ওত পেতে, কে জানে ! কে জানে কোন ডালে চিতা আছে ঘাপটি মেরে।

এ-বছর ভয়ানক খরা। বারশিঙার জলা ছাড়া সবজায়গার জল গেছে শুকিয়ে, কিন্তু তেষ্টায় ছাতি ফেটে গেলেও সেখানে যাবার উপায় নেই। বাচ্চা-কাচ্চা সমেত বুড়ো ময়াল সেখানে আড্ডা গেড়েছে। তাদের যদি বা এড়ান যায়, কেঁদোর হাতে নিস্তার নেই। কেঁদো একেবারে শিকড় গেড়ে বসেছে সেখানে। এর আগে এমন কখনও হয়নি। কেঁদো তখন বনে এসেছে, দু-দশটা মেরেছে, আবার চলে গিয়েছে অন্য বনে। এবার তারও যেন আর নড়বার নাম নেই। কিন্তু জল বিহনে আর কদিন থাকা যায় ! তেষ্টায় পাগল হয়েই বুনো মোষের মা কাকিনী গিয়েছিল মরিয়া হয়ে বারশিঙার জলায়। সেখানে পিছন থেকে পড়ল এসে ঘাড়ে কেঁদো। কাকিনী পিছল জমিতে পাশ ফিরতে না ফিরতেই গর্দান গেল ভেঙে।

সেই দেখে বনের আর কেউ ঘেঁষতে চায় না সেদিকে। দুন পাহাড়ে চিকারার দল ছটফট করছে, জলে নামতে সাহস হয় না।

কলজে ফেটেই কটা মরল। ঝাঁকাল হরিণের নূতন লোমের জলুস নেই—সেই ফ্যাকাশে হলদেই দেখায়। মেটে কাল গাউজের দল ঘুরে বেড়ায় বনে বনে। কালোয়ার গাউজকে দেখলে সত্যিই কান্না পায়। এই খরার দিনে জলে 'গারি' নিতে না পেয়ে তার যা দুর্দশা!

কালোয়ার গাউজের বউ ঢুলানির সঙ্গে সেদিন হনুর দেখা। হাড্ডিসার চেহারা হয়েছে ; গায়ের লোম গিয়েছে উঠে।

বুনো নোনাগাছে হনু ছিল বসে। ঢুলানি নীচে দিয়ে যেতে যেতে উপরে খস্‌খসে আওয়াজ শুনে চমকে কান খাড়া করে দাঁড়াল। হনু তাড়াতাড়ি অভয় দিয়ে বললে, "না গো না, চিতা নয়, আমি হনু!"

হতাশভাবে ঢুলানি বললে, "আর চিতা হলেই বা কী! এখন চিতায় থাবা মারলেই হাড় জুড়োয়। এ-যন্ত্রণা আর সহ্য হয় না।"

দরদ জানিয়ে হনু বললে, "অমন কথা বলতে আছে! এমন দিন কি আর থাকবে ?"

ঢুলানি এ-কথায় সান্ত্বনা পায় না। বললে, "থাকবে বলেই ত মনে হচ্ছে। কেঁদো আর চিতার কি মরণ আছে ?"

হনু গম্ভীর হয়ে বললে, "আছে বই কি, কিন্তু উপায় করতে হবে!"

ঢুলানি একটু উৎসাহিত হয়ে বললে, "উপায় কিছু ঠাউরেছ নাকি ?"

"সেদিন গিয়েছিলাম ত তাই হুতুমের কাছে। কিন্তু জান ত ওদের চাল ? গায়েই সহজে মাখতে চায় না।"

ঢুলানি উপর দিকে চেয়ে ছিল এতক্ষণ, এবার বললে, "দুটো পাকা নোনা ফেলে দাও না ভাই, জিভটা একটু ভিজুক, জলের তার ত ভুলেই গেছি।"

হনু পাকা দেখে ক'টা নোনা ফেলে দিয়ে বললে, "আচ্ছা, ঝোপে-ঝাড়ে ঘোরো, চন্দ্রচূড়ের দেখা পাও না, না হয় কালকেউটের ? ওদের বলে দেখলে বোধ হয় কাজ হয় ; এক ছোবলেই কাবার।"

নোনা চিবোতে চিবোতে ঢুলানি বললে, "পাগল! ওরা কারুর উপকার করবে! বলতে গেলে আমাদেরই দেবে ছুবলে। সেই যে কথায় আছে—

পা নেই, বুকে হাঁটে
ডিমের ছা মাকে কাটে।

ওরা ত আর মার দুধ খায় না।"

হনু মাথা নেড়ে বললে, "তা বটে। তা না হলে ওই বারশিঙার জলার বুড়ো ময়াল একদিন কেঁদোর গায়ে পাক দিতে পারে না? তা ত দেবে না—তার বদলে হাড়-পাঁজরা ভাঙবে যত চিতল আর খাউট্টা হরিণের। নাঃ, হুতুমের কাছে একবার যেতেই হয় পরামর্শ করতে। বুড়োটার যে দেখাই পাওয়া যায় না।"

ঢুলানি গাছের গায়ে দু বার শিঙ ঘষে চলে যেতে যেতে বললে, "কী হয় না হয় খবরটা দিও।"

হনু এক ডাল থেকে আর-এক ডালে লাফিয়ে বসে বললে, "সন্ধ্যাবেলা? 'থলায়' গেলেই পাব ত?"

ঢুলানি বিষণ্ণভাবে বললে, "থলায় কি আর কেউ যায়? সে-আমোদের দিন গিয়েছে। খবর দিও নুন পাহাড়ের তলায়…"

ঢুলানি আরও কিছু হয়ত বলত; কিন্তু হঠাৎ শোনা গেল কাছেই কেঁদোর কাশি। ঢুলানি মাথা তুলে পিঠে শিঙে ঠেকিয়ে উর্ধ্বশ্বাসে দিলে ছুট। হনু দুটো ডাল আরও উপরে বসেছে ততক্ষণে।

কদিন বাদে আবার হুতুমের সঙ্গে হনুর দেখা। সবে সকাল হয়েছে, আগের রাতে হুতুমের ভোজটা একটু ভাল রকমই হয়েছে মনে হল। দু চোখ বুজে গাছের কোটরে হুতুম যেন ধ্যানে বসে ছিল।

আগের রাত্রে নূতন শিঙের চামড়া ঘষে তোলবার সময় 'কাল-

শিঙে' চিতার হাতে মারা গিয়েছে। হনু সেই খবরটা তুন পাহাড়ে চিকারার দলে প্রচার করবার জন্য তাড়াতাড়ি চলেছিল, হঠাৎ গাছের কোটর থেকে 'হুম' শুনে চমকে দাঁড়াল।

তারপর দেখতে পেয়ে বললে, "এই যে দাদা! কদিন ধরে তোমাকে বাদাম খোঁজা করছি।"

হুতুমের মেজাজটা আজ ভাল, বললে, "কেন হে?"

"কেন, আবার বলতে হবে? তোমার মত বিজ্ঞ, বুদ্ধিমান দু-পেয়ে থাকতে এ-বনে আমরা সবাই কি মারা পড়ব বলতে চাও। দোহাই হুতুমদা, একটা উপায় বাতলাও।"

হুতুম বললে, "হুম, বলব'খন।"

হনু অস্থির হয়ে উঠেছিল। বললে, "না, বলব'খন নয়, এখনই। তোমার দেখা ত আর তপিস্যে করলেও মেলে না, এখন যখন পেয়েছি আর ছাড়ছিনে।"

হুতুম বললে, "হুম, বলছি, উপায় ত বলতে পারি, কিন্তু লাভ কী?"

"কী যে বল হুতুমদা, লাভ কী? এই নখ-চোরা দুটো মরলে আর আমাদের ভাবনা কী?"

হুতুম গম্ভীরভাবে বললে, "আর ভাবনা থাকবে না ত?"

"নিশ্চয়ই না।"

হুতুম বললে, "হুম, তবে শোন। বারশিঙার জলা পেরিয়ে কসাড় বন ছাড়িয়ে যে দু-পেয়েদের গাঁ, চিনিস?"

হনু বললে, "খুব চিনি, আমার ভাই খাটো-ল্যাজকে সেখানেই ত ধরে রেখেছে।"

হুতুম বললে, "হুম! সে-গাঁ থেকে দু-পেয়ে আনতে হবে।"

হনু একটু হতাশ হয়ে বললে, "বাঃ, তারা আসবে কেন?"

হুতুম বললে, "হুম, আসবে রে, আসবে। তুন পাহাড়ের রাঙা

মুড়ি দেখেছিস, ভোরবেলায় সূর্যির মত লাল? সেই মুড়ির টানে আসবে।"

হনু শুনে ত অবাক। বললে, "সে-মুড়ি ত চোখে দেখেছি, না যায় দাঁতে ভাঙা, না আছে কোন রস। সেই মুড়ি নিয়ে কী হবে দু-পেয়ের?"

হুতুম একটু চটে উঠে বললে, "তুই দু-পেয়ের হালচাল কী জানিস?"

হনু অগত্যা চুপ করল। হুতুম আবার বললে, "কসাড় বনের ধারে গারো-বাদার পাশে দু-পেয়েরা আসে বেত কাটতে; তাদের সেই মুড়ি দেখাতে হবে।"

"কেমন করে দেখাব?"

"কেমন করে আবার দেখাবি! বেত-বনে মুড়ি ছড়িয়ে রেখে দিগে যা; এদিকে ওদিকে আর কিছু ছড়াস। দু-পেয়ের চোখ সব দেখতে পায়।"

হনু অবাক হয়ে বললে, "তা না হয় দেখল, কিন্তু আমাদের তাতে কী হবে? কেঁদো আর চিতাকে সামলাবে কে?"

হুতুম গম্ভীর হয়ে বললে, "সে-ভাবনা তোর কেন? যা বললাম কর আগে, তারপর বসে বসে দেখ, কী হয়। অতই যদি বুঝবি তা হলে গায়ে পালক গজাবে যে।"

হাজার হলেও হুতুম জ্ঞানীগুণী লোক। এ-ঠাট্টা নীরবে হজম করে হনু বললে, "তবে কুড়ইগে মুড়ি, কেমন? ঠিক বলছ ত হুতুমদা, এতেই হবে?"

হুতুম শুধু বললে, "হুম।"

* * *

তারপর ক'বছর কেটে গিয়েছে। তরঙ্গিয়ার জঙ্গলের আর সে-চেহারা নেই। জঙ্গল অনেক সাফ হয়ে গিয়েছে। কত গাছ যে কাটা

পড়েছে তার ঠিকঠিকানা নেই। ছুন পাহাড়ের উপরে আর নীচে কাঠের আর পাথরের বাসা। দু-পেয়েরা রাতে সেখানে ঘুমোয় আর দিনে পাহাড় কেটে খানখান করে। পাহাড়টাই বুঝি তারা ফেলবে খুঁড়ে।

হনুর আজকাল ভারী বিপদ। বন্ধুবান্ধব কেউ আর বড় তরঙ্গিয়ায় নেই। তবু বন ছাড়তেও তার মন কেমন করে। তাই কোন রকমে সে পড়ে আছে।

সেদিন হঠাৎ বাদাম গাছে হুতুমের সঙ্গে দেখা। গাছপালা গিয়েছে কমে; দিনের বেলা বনে আজকাল তেমন অন্ধকার হয় না। হুতুম তাই চোখে বড় কম দেখে। হনু 'দাদা' বলে ডাক দিতে প্রথমটা ত চিনতেই পারল না।

তারপর মিটমিট করে খানিক ঠাউরে বললে, "কে হনু নাকি? আছিস কেমন?"

হনু ম্লান ভাবে বললে, "আছি আর কেমন দাদা!"

হুতুম আবার চোখ বুজবার উপক্রম করছিল, হনু বললে, "তরঙ্গিয়ার জঙ্গলের কী হাল হয়েছে দেখেছ ত দাদা!"

হুতুম একটু অবাক হয়ে বললে, "কেন, কেঁদো আর চিতা ত' অনেকদিন মারা পড়েছে! সেই খরার বছরেই না?"

"তা ত পড়েছে, কিন্তু সেই সঙ্গে আমরাও যে লোপাট হয়ে গেলাম। সারা দিন ঘুমোও, খোঁজ ত আর কিছুর রাখ না? ছুন পাহাড়ের চিকারার বংশে বাতি দেবার যে কেউ নেই। দু-পেয়ের যে বাজ-লাঠিতে কেঁদো গেছে, তাতেই চিকারার দফা-রফা। গাউজদের যে-কটা বাকী ছিল, কোন বনে যে গেছে কোন পাত্তা নেই। ঝাকাল দু-একটা আছে এখনও, কিন্তু আর বেশী দিন নয়; বাজ-লাঠিতে গেল বলে। বুড়ো ময়াল পর্যন্ত তল্লাট ছেড়ে গেছে।

দিনরাত গুড়ুম গুড়ুম, দিনরাত খটাখট। এ-গাছ পড়ছে, ও-গাছ পড়ছে। দু দণ্ড ত আর স্বস্তি নেই।”

হুতুম বললে, “হুম।”

“তোমার কথায় নুড়ি ছড়িয়ে প্রথমটা ত ভালই হল। আজ দুজন কাল চারজন, দু-পেয়েরা ক্রমে ক্রমে ঝাঁকে ঝাঁকে আসতে লাগল তরঙ্গিয়ায়। তারা কেঁদোকে মারল বাজ-লাঠিতে, চিতাকে ধরল ফাঁদে। আমরা ত একেবারে স্বর্গ পেলাম হাতে। ওমা, তারপর আমাদেরই পালা কে জানত? তুন পাহাড়ে তারা যেদিন বাসা বাঁধল তার পর থেকেই আমাদের হল সর্বনাশ। কেঁদো আর চিতা তবু একটা-দুটোর বেশী মারত না, এদের হাতে দলকে দল সাবাড়।”

হুতুম গম্ভীর মুখে বললে, “হুম।”

“ভাল করতে গিয়ে এ কী হল বল ত?” হনু কাঁদো কাঁদো হয়ে বললে, “তরঙ্গিয়ার এ-দশা ত চোখে দেখা যায় না।”

হুতুম চোখ বুজে প্রশান্তভাবে বললে, “যা হবার ঠিক তাই হয়েছে; চোখ বুজে থাকতে শেখ, কিছু দেখতে হবে না।”

এক অমানুষিক আত্মহত্যা

খবরের কাগজ যাঁহারা নিয়মিতভাবে পড়িয়া থাকেন তাঁহাদের বোধ হয় স্মরণ আছে যে, ১৩৪৫ সালের ৩রা ভাদ্র তারিখের বঙ্গবাণী পত্রিকার সাতের পাতায় তৃতীয় কলমের ৩০ লাইন পরে একটি বিস্ময়কর সংবাদ বাহির হইয়াছিল। স্মরণশক্তি যাঁহাদের সবল নয় তাঁহাদের জন্য উক্ত সংবাদটি এখানে যথাযথ ভাবে আমরা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

গৌহাটি নগরে বিষম চাঞ্চল্য

রাজপথে ব্যাঘ্রের আবির্ভাব

"গতকল্য সন্ধ্যার পর কেমন করিয়া একটি বৃহদাকার ব্যাঘ্র নগরের ভিতর প্রবেশ লাভ করে। অনেক রাত্রি পর্যন্ত শহরের নানাস্থানে বহু ব্যক্তি তাহাকে দেখিয়া ভীত হয়। ব্যাঘ্রটিও শহরের ভিতর হইতে বাহির হইবার পথ খুঁজিয়া না পাইয়া স্থান হইতে স্থানান্তরে উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে ঘুরিয়া বেড়ায়! সকাল বেলা জনৈক শ্বেতাঙ্গ অধিবাসীর বাড়ির নিকট দিয়া যাইবার সময় উক্ত ভদ্রলোকের বন্দুকের গুলিতে তাহার ভবলীলা সাঙ্গ হইয়াছে। সুখের বিষয় নগরের কোন ব্যক্তির তাহার দ্বারা কোন অনিষ্ট হয় নাই।" ২রা ভাদ্র, গৌহাটি।

বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকেরা একবাক্যে চিরকাল প্রচার করিয়া আসিতেছেন যে, কোন ঘটনাই অকারণ বা নিরর্থক নয়। সুতরাং গৌহাটি শহরে এই ব্যাঘ্রপ্রবরের আবির্ভাবেরও কোন না কোন দিক দিয়া নিশ্চয়ই প্রয়োজন ছিল।

সে-প্রয়োজন যে কী তাহা বুঝিবার পূর্বে কিন্তু আমাদের আত্মনাথের জীবন-বৃত্তান্ত কিছু জানা আবশ্যক।

আত্মনাথ বিংশ শতাব্দী অপেক্ষা বয়সে বছর আষ্টেকের ছোট হইলেও কল্পনায় চিন্তায় তাহাকে ছাড়াইয়া গিয়াছে। আগামী বর্ষের মোটরকারের মডেল অপেক্ষাও সে ঝকঝকে, তকতকে, আধুনিক; কলিকাতা নগরীতে এমন কোন সভা-সমিতি বা সম্মিলনী হয় না যেখানে আত্মনাথকে তাহার রুপাবাঁধানো ছড়ি, গগল্‌স চশমা ও মাদ্রাজী চাদর সমেত দেখা না যায়। তাহার কবিতা বাংলার প্রায় সমস্ত মাসিকেরই পাদপূরণ করিয়া থাকে এবং এদেশের যে-কোন স্বল্পায়ু পত্রিকা খুলিলেই দেখা যায় আত্মনাথের রচিত গল্প তাহার শোভাবর্ধন করিতেছে।

ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করিবার পূর্বে আত্মনাথ কখনও ইলেকট্রিক লাইট দেখে নাই এবং তাহাদের পদ্মাতীরস্থ গ্রামের মৈনুমাঝির 'গহনা'র নৌকা ছাড়া কোন বাহন ব্যবহার করে নাই। সেই জন্যই কলেজে পড়িবার জন্য প্রথম কলিকাতায় আসিয়া আত্মনাথ শহরের ঐশ্বর্য ও আড়ম্বরে একেবারে অভিভূত হইয়া গেল। এবং দুই বৎসরের মধ্যে আত্মনাথকে আর চিনিবার উপায় রহিল না। পরিবর্তন যে শুধু তাহার বেশভূষায় ও আচরণে ঘটিল তাহা নয়, তাহার মনোজগতেও সমস্ত ওলট-পালট হইয়া গেল। আত্মনাথের সে উৎকট উৎকর্ষের পরিচয় কিন্তু আমরা দিতে অক্ষম, পাঠকদের অনুমানের উপর তাহা ছাড়িয়া দিলাম।

কলেজে পড়িতে আসিয়া প্রথম প্রথম আত্মনাথ ছুটিতে দেশে যাইত, কিন্তু ক্রমশ দেখা গেল কলিকাতাতে তাহার কাজ এত বেশী যে, দেশে যাইবার তাহার অবসর নাই। অন্তত মা চিঠির পর চিঠিতে তাহাকে আসিতে লিখিয়া ওই কথাই জবাব পাইতেন।

মাতার সাংঘাতিক অসুখের তার পাইয়া আত্মনাথ দেশে গিয়া দেখিল বিবাহের আয়োজন চলিতেছে।

এই প্রবঞ্চনায় আত্মনাথ চটিল, কিন্তু পিতার সামনাসামনি প্রতিবাদ করিতে সাহস করিল না। বিবাহ তাহার হইয়া গেল।

যেমনই হোক, বিবাহের রাত্রের বোধ হয় একটা নেশা আছে। নিজের অনিচ্ছাসত্ত্বে বিবাহ করিতে বাধ্য হইলেও আত্মনাথের আগাগোড়া ব্যাপারটা খুব খারাপ লাগিতেছিল বলা যায় না। শুভ-দৃষ্টির সময় মেয়েটিকে অত্যন্ত কঠোর সমালোচনার দৃষ্টিতে দেখিয়াও চেহারার খুঁত সে বিশেষ বাহির করিতে পারে নাই। শেষ পর্যন্ত হয়ত সব ভালই হইত, কিন্তু বাসরঘরে শ্যালিকা সম্পর্কীয়া গ্রাম্য মেয়েরা তাহার মেজাজ একেবারে চটাইয়া দিল। বাংলার আধুনিক চিন্তা ও শিল্প জগতের একজন উদীয়মান দিকপালের কোন সম্মান তাহারা রাখিল না। নানাপ্রকার অসভ্য অভদ্র ইতরজনোচিত রসিকতা করিয়া তাহাকে একেবারে নাকাল করিয়া তুলিল। ইহার উপর আবার তাহার নববিবাহিতা বধূ নীলিমা এক সময়ে তাহার লাঞ্ছনায় ঘোমটার তলাতেও হাসি চাপিতে না পারিয়া তাহার মন একেবারে বিষ করিয়া দিল।

নীলিমার ভাগ্য মন্দ। ফুলশয্যার রাত্রে স্বামী তাহার সহিত কথাই কহিল না এবং তাহার পরদিন যখন সে শুনিল যে, আত্মনাথ কাহাকেও কিছু না বলিয়া কলিকাতায় পলাইয়া গিয়াছে তখন তাহার লজ্জা ও দুঃখের অবধি রহিল না!

ইহার পর আর বহুদিন আত্মনাথ ও নীলিমার দেখা হয় নাই। আত্মনাথের পিতা অত্যন্ত তেজস্বী লোক। পুত্রের ব্যবহারে মর্মাহত হইয়া তিনি তাহার মুখদর্শন করিবেন না বলিয়াছেন। আত্মনাথ আর দেশেও যায় না। যাইবার তাহার বিশেষ ইচ্ছাও নাই।

আত্মনাথ কলিকাতায় না থাকিলে বাংলার সাহিত্য যে কানা হইয়া যায়।

নীলিমার পিতা জামাইকে দেশে আনিবার বিস্তর চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু আত্মনাথের মন গলে নাই। যে-সব অসভ্য অশিক্ষিত মেয়ের হাতে সে অমন অভদ্রভাবে লাঞ্ছিত হইয়াছে, তাহাদেরই অনুরূপ একটি নোলক-পরা গ্রাম্য মেয়ের প্রতি তাহার মনে কোন করুণা নাই।

ইতিমধ্যে আত্মনাথ ও নীলিমার মধ্যে মাত্র দুইটি চিঠি লেখা-লিখি হইয়াছিল।

স্বামীর অবহেলায় অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইয়া লজ্জার মাথা খাইয়া সখীদের অনুরোধে নীলিমা একবার একটি চিঠি লিখিয়াছিল ।

আত্মনাথ তাহার উত্তরে যাহা লিখিয়াছিল তাহা আমরা প্রকাশ করিয়া দিলাম।

আত্মনাথ লিখিয়াছিল, "তোমার চিঠি পাইলাম। তুমি আমার পত্রের উপর 'শ্রীচরণেষু' কেন লিখিয়াছ বুঝিতে পারিলাম না। তুমি আমার ক্রীতদাসী নও যে আমার চরণবন্দনা করাই তোমার কাজ। তা ছাড়া আমার শুধু চরণেই তুমি যদি শ্রী দেখিয়া থাক তাহা হইলে আমার পক্ষে সেটা গৌরবের কথা নয়। 'শ্রীচরণেষু' বানান করিতেও তুমি ভুল করিয়াছ। তোমার পত্রে বানান ভুল ওই একটি নয়, আরও যথেষ্ট আছে। ভাল করিয়া লেখাপড়া না শিখিয়া চিঠি লিখিতে যাওয়া বিড়ম্বনা। আমাকে প্রিয়তম বলিয়া সম্বোধন করিতে তোমার কোন সখী শিখাইয়াছে জানি না, কিন্তু এইটুকু বুঝিতে পারি যে, কোন সভ্য মেয়ের সহিত তোমাদের পরিচয় হয় নাই। ফুল-আঁকা লাল চিঠির কাগজ ব্যবহার করিতে তোমার লজ্জা হওয়া উচিত ছিল।"

ইহার পর আর তাহারা কেহ কাহাকেও চিঠি লেখে নাই।

এমন করিয়া কতদিন যাইত বলা যায় না, কিন্তু ইহার ভিতর গৌহাটিতে বড় গোছের একটা সম্মিলনী বসিল এবং আত্মনাথকে তাহার কাগজের তরফ হইতে বিশেষ সংবাদদাতারূপে সেখানে যাইতে হইল।

সম্মিলনী শেষ হইয়াছে। আত্মনাথ কলিকাতায় ফিরিবার জন্য প্রস্তুত, এমন সময় হঠাৎ রাস্তায় আশ্চর্যভাবে তাহার শ্বশুর মহাশয়ের সঙ্গে দেখা। শ্বশুর মহাশয় আকাশের চাঁদ হঠাৎ ধূলির ধরণীতে নামিয়া আসিয়াছে এমনি ভাব দেখাইয়া বলিলেন, "তুমি এখানে? কটার ট্রেনে এলে? আজ বড্ড জরুরি কাজে একটু সকালে বেরুতে হয়েছিল, নইলে দেখা হয়ে যেত।"

সে তাঁহাদেরই বাড়িতেই আসিয়াছে এমন ভুল করার ধৃষ্টতার জন্য শ্বশুরের উপর চটিয়া আত্মনাথ গম্ভীরভাবে উত্তর দিল, "আমি আজ আসিনি, চলে যাচ্ছি। এখানকার সম্মিলনীতে এসেছিলাম গত রবিবার।"

পলকের মধ্যে শ্বশুরের মুখে গভীর পরিবর্তন দেখা গেল। অত্যন্ত ক্ষুণ্ণস্বরে তিনি বলিলেন, "এখানে এতদিন এসেছ, আর আমাদের সঙ্গে দেখা করনি?"

আত্মনাথ এবার সত্য কথাই বলিল, "আপনারা এখানে এসেছেন তা কেমন করে জানব?"

"বাঃ, আমি যে এখানে বদলী হয়েছি আজ তিনমাস, তা জানতে না?"

না জানিবারই কথা। গত কয়েকমাস শ্বশুরবাড়ির চিঠির প্রতি বিশেষ মনোযোগ সে দেয় নাই। আত্মনাথ চুপ করিয়া রহিল।

শ্বশুরমহাশয় বলিলেন, "বেশ, এখন ত জানলে, আজ আর না দেখা করে যেতে পারবে না।"

একা থাকিলে রূঢ়ভাবে বা যে-কোন রকম ওজর আপত্তি

তুলিয়া হোক আত্মনাথ এ-নিমন্ত্রণ এড়াইয়া আসিতে পারিত। কিন্তু সঙ্গে কলিকাতার জন দুই বন্ধু ছিল। ইহাদের কাছে তাহার বিবাহের সংবাদ গোপন করিয়া রাখার দরুন অমনিই সে এখন বেশ বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিল। শ্বশুর মহাশয়ের ভাবগতিক দেখিয়া মনে হইল তিনি প্রয়োজন হইলে শেষ অস্ত্র হিসাবে ইহাদের কাছে জামাইয়ের নিদারুণ ঔদাসীন্য সম্বন্ধে অভিযোগ করিতেও পশ্চাদপদ হইবেন না। আত্মনাথ 'না' বলিতে পারিল না, কিন্তু রাস্তার মাঝে হঠাৎ এমনভাবে আবির্ভূত হইয়া তাহার সমস্ত রহস্য প্রকাশ করিয়া বন্ধুদের কাছে অপ্রস্তুত করিবার জন্য শ্বশুর এবং তাহার সমস্ত পরিবারবর্গের উপর বিষম বিদ্বিষ্ট হইয়া উঠিল।

এতদিন বাদে জামাতার আগমনে তাহার আদর-আপ্যায়নের যেরূপ ঘটা হইল, তাহাতে আর কিছু না হক আত্মনাথের অহঙ্কার তৃপ্ত হইবার কথা। সাহিত্য-জগতে তাহার মূল্য যে কত তাহার একটা হিসাব আত্মনাথ মনে মনে কষিয়া রাখিয়াছে, কিন্তু সে-মূল্য এখনও পর্যন্ত প্রত্যক্ষ ভাবে তাহাকে কেহ দেয় নাই। এই একটি বাড়িতে পৃথিবীর এত লোকের মাঝে তাহার জন্যই এতখানি সম্মান যে জমা হইয়া আছে, তাহা জানিতে পারিয়া আত্মনাথ হয়ত সম্পূর্ণ ভাবে খুশীই হইত, কিন্তু সে-খুশির মাঝে একটি খুঁত রহিয়া গেল।

বাসরঘরে তাহাকে যাহারা অশেষপ্রকারে লাঞ্ছিত করিয়াছিল, তাহাদেরই অধিনায়িকাকে এ-বাড়িতে উপস্থিত দেখিয়া তাহার মন দমিয়া গেল। জানা গেল মলিনা সম্পর্কে তাহার স্ত্রীর মামাতো বোন, কয়েকদিনের জন্য এখানে বেড়াইতে আসিয়াছে।

মলিনা প্রথমটা নিরীহ ভালমানুষটির মত যেভাবে আসিয়া তাহার সহিত আলাপ করিল তাহাতে আত্মনাথের আশঙ্কা অনেকটা দূর হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু কিছুক্ষণ বাদেই নিজের ভুল সে বুঝিতে পারিল।

শ্বশুরের বিস্তর অনুরোধ অনুযোগ সত্ত্বেও জরুরি কাজের অজুহাত দেখাইয়া আত্মনাথ সন্ধ্যার পরই তাহাকে কলিকাতায় যাইবার জন্য ছাড়িয়া দিতে হইবে, এ-প্রতিশ্রুতি আদায় করিয়া লইয়াছিল। জামাতা যদি বা অনেক কষ্টে একবার আসিয়াছে, তাহাকে বেশী থাকিবার জন্য পীড়াপিড়ি করিয়া চটাইতে শ্বশুর মহাশয়ের সাহস হয় নাই। আত্মনাথ নিশ্চিন্ত হইয়াছিল। এমন সময় শাশুড়ী ঠাকরুন প্রসন্নমুখে আসিয়া বলিলেন, "তোমাকে একবার জিজ্ঞাসা করতে এলাম বাবা, তোমাদের বাড়িতে যে নিয়মের কড়াকড়ি, রাত্রে তুমি মাংস খাবে ত ?"

আত্মনাথ অবাক হইয়া বলিল, "মাংস রাত্রে ত আমি খাব না, আমায় খানিক বাদেই কলকাতা যেতে হবে যে ?"

মলিনা সঙ্গেই আসিয়াছিল। শাশুড়ী একটু অপ্রস্তুত হইয়া বলিলেন, "বাঃ, এই যে মলিনা বললে, তুমি থাকতে রাজী হয়েছ ?"

আত্মনাথকে কোন কথা বলিবার অবসর না দিয়া মলিনা তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "আহা, এখন আবার লজ্জা দেখান হচ্ছে ? অত ভণ্ডামি কেন বাপু, এইমাত্র আমায় কী বললে ?"

লজ্জায় রাগে আত্মনাথের মুখ দিয়া আর কথা বাহির হইল না। মলিনা আবার বলিল, "তুমি যাও না পিসিমা। দু বছর গা ঢাকা দিয়েছিলেন, তাই এখন লজ্জা হয়েছে, বুঝতে পারছ না।"

শাশুড়ী ঠাকরুন চলিয়া গেলেন। আত্মনাথ গুম হইয়া বসিয়া রহিল।

ফুলশয্যার রাত্রের পর স্বামী স্ত্রীর এই প্রথম দেখা।

আত্মনাথ ঘরে ঢুকিতেই নীলিমা ফিক করিয়া হাসিয়া ফেলিল। হাসিটি ভারী মিষ্ট। কিন্তু আত্মনাথের মন তখন মলিনার শঠতায়

তিক্ত হইয়া আছে। নহিলে সে শুধু হাসি নয়, অনেক কিছুই দেখিতে পাইত। দুই বৎসরে নীলিমার শ্রী অনেক ফিরিয়াছে। তাহার বেশভূষায় যে গ্রাম্যতা সম্বন্ধে আত্মনাথের বিরূপতা, তাহারও আর কোন চিহ্ন নাই। ফিকে নীল একটি ব্লাউসের উপর চওড়া কস্তাপাড় শাড়িটিতে তাহাকে চমৎকার মানাইয়াছে। আত্মনাথ কোন দিকেই নজর না দিয়া গম্ভীর হইয়া খাটের এক ধারে গিয়া বসিল। কিন্তু স্বামীর ঔদাসীন্যে অভিমান করিবার অবসর আর নীলিমার নাই। এই দুই বৎসরে সে অনেক দুঃখ পাইয়াছে। নিজেই অগ্রসর হইয়া সলজ্জভাবে স্বামীর একটা হাত ধরিয়া সে মৃদুস্বরে বলিল, "তুমি আমার উপর রাগ করেছ ?"

আত্মনাথ হাতটা ছাড়াইয়া লইল, উত্তর দিল না। নীলিমার চোখে হয়ত জল আসিল, তবু সে নিরস্ত হইল না। আর একবার স্বামীর হাত ধরিয়া সে বলিল, "আমার কী দোষ বল ?"

আত্মনাথ তিক্তকণ্ঠে বলিল, "তোমরা সব সমান, ওই মলিনার ত তুমি বোন। আর এরকম জুয়াচুরি করে আমায় একদিন ধরে রেখে খুব লাভ হবে মনে করছ ?"

কথাটা বড় রূঢ়। তবু নীলিমা মৃদুকণ্ঠে বলিল, "দিদির কী দোষ বল, আমাদের জন্যেই ত করেছে। তোমার নিজের কি একদিন থাকার ইচ্ছে হয় না ?"

আত্মনাথ গম্ভীর হইয়া বলিল, "না।"

নীলিমা এবার অত্যন্ত আহত হইল। আজ সে অনেক আশা করিয়া স্বামীর দেখা পাইবার জন্য বসিয়া ছিল। শোবার ঘরের কুলঙ্গিতে তাহার বই খাতা সাজানো। এই দুই বৎসর স্বামীকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য সে কী ভাবে পড়াশুনা করিয়াছে, কতখানি নির্ভুল ও নিখুঁতভাবে লিখিতে শিখিয়াছে, তাহার বড় আশা ছিল সমস্তই সে স্বামীকে দেখাইবে। এই রূঢ় আঘাতে সমস্ত

আশা চুরমার হইয়া তাহার একটু রাগই হইল। বলিল, "তাহলে তুমি না থাকলেই ত পারতে।"

স্বরে ঈষৎ কাঠিন্যের পরিচয় পাইয়া আত্মনাথ একটু অবাক হইয়া বলিল, "তাই নাকি ?"

নীলিমা আরও কঠিন স্বরে বলিল, "নিশ্চয়, তোমাকে ত কেউ জোর করে ধরে রাখেনি।"

আত্মনাথ বিছানা হইতে উঠিয়া ব্যঙ্গের স্বরে বলিল, "বটে! আমি ভেবেছিলাম তুমি বুঝি রাখতে চাও।"

নীলিমা বলিয়া ফেলিল, "আমার দায় পড়েছে।"

"আচ্ছা, তাহলে চললাম"—বলিয়া হঠাৎ গট্ গট্ করিয়া দরজার কাছে গিয়া আত্মনাথ খিল খুলিয়া ফেলিল! মুখ দিয়া রাগের মাথায় অমন একটা কথা বাহির হইয়া পড়িবে ও তাহার পরিণতি এমন হইবে নীলিমা ভাবে নাই। সে ভীত হইয়া একবার আত্মনাথকে বারণ করিতে গেল। কিন্তু "আর কখনও দেখা হবে না, মনে রেখ!" বলিয়া চক্ষের নিমেষে আত্মনাথ দরজা খুলিয়া তখনই বাহির হইয়া গিয়াছে।

অন্ধকার রাত। দরজার বাহিরে তারের বেড়ায় ঘেরা একটি বাগান অস্পষ্টভাবে দেখা যাইতেছিল। বাগানের কাঁকর দেওয়া পথ খানিকটা পার হইয়া লোহার গেট।

আত্মনাথ অন্ধকারের ভিতর হাতড়াইয়া গেটের হাতল খুঁজিয়া পাইয়া আশ্বস্ত হইয়া দেখিল গেট বন্ধ নয়। কিন্তু গেট খুলিতে গিয়া মুশকিল হইল। অন্ধকারে মনে হইল একটা গরুই বোধ হয় গেটের গায়ে হেলান দিয়া শুইয়া আছে, তাহাকে না উঠাইলে গেট খোলা যায় না।

আত্মনাথ গরুটাকে উঠাইবার জন্য বলিল, "হেট্ হেট্।" গরুটা তবু উঠিল না। আত্মনাথ অসহিষ্ণু হইয়া গেটটা নাড়িয়া

তাহার গায়ে আঘাত করিয়া আবার বলিল, "হেট্ হেট্, ওঠ্ বেটা!"

হঠাৎ গরুটা একটু গা নাড়া দিয়া অদ্ভুত এক আওয়াজ করিল। গরুর গলা হইতে এমন আওয়াজ আত্মনাথ কখনও শোনে নাই। একটু বিস্মিত হইয়া আর একবার গেট নাড়া দিতেই গরুটা উঠিয়া দাঁড়াইল এবং সঙ্গে সঙ্গে আত্মনাথের মাথার চুল পর্যন্ত খাড়া হইয়া উঠিল। হাজার অন্ধকার হইলেও গরু কখনও এমন আকৃতি লাভ করিতে পারে না।

যেটুকু সন্দেহ আত্মনাথের মনে ছিল, তথাকথিত গরুর আর একটি আওয়াজেই তাহা দূর হইয়া গেল। আর গেট খোলার সমস্ত বাসনা পরিত্যাগ করিয়া এক ছুটে সে একেবারে বাড়ির রকে গিয়া হাজির। কিন্তু এখন উপায়? যে জানোয়ারটিকে সে গেটের ধারে দেখিয়া আসিয়াছে, তাহাকে কল্পনার ছায়ামূর্তি বলিয়া উপেক্ষা করিবার সাহস তাহার নাই। শহরের ভিতর গৃহস্থপল্লীর মাঝখানে বিশালকায় ব্যাঘ্রের আবির্ভাব সাধারণ যুক্তিতে যত অসম্ভবই মনে হউক, নিজের চোখকে সে অবিশ্বাস করে কী করিয়া? এ-গেটের বাহিরে যাওয়া তাহার পক্ষে আজ অসম্ভব। কিন্তু অমন করিয়া তেজ দেখাইয়া চলিয়া আসিবার পর স্ত্রীর ঘরে সে ফিরিবেই বা কেমন করিয়া? কথাগুলি লিখিতে যত বিলম্ব হইল আত্মনাথের চিন্তা অবশ্য তাহা অপেক্ষা আগেই শেষ হইয়া গিয়াছে।

বাহিরের গেটের কাছে ভূতপূর্ব গোবৎসের নড়িবার শব্দ পাইয়া আত্মনাথ একমুহূর্তে ঘরের ভিতর গিয়া দরজার খিল লাগাইয়া দিল, তারপর ফিরিয়াই দেখিল, মলিনা তাহার রোরুদ্যমানা স্ত্রীর মাথায় হাত বুলাইয়া দিতেছে।

অবস্থাটা একটু অস্বস্তিকর, কিন্তু আন্তনাথের আর যাহাই হোক উপস্থিত বুদ্ধির অভাব ছিল না।

মলিনা তাহার দিকে ফিরিয়া ব্যঙ্গের স্বরে বলিল, "কীগো বীরপুরুষ, স্ত্রীকে ফেলে পালিয়েছিলে কোথায় ?"

সদ্য সদ্য যে ঘটনাটি ঘটিয়া গিয়াছে, বীরপুরুষ সম্বোধনটা সেই ব্যাপারকে লক্ষ্য করিয়া নিশ্চয়ই করা হয় নাই, তবু আদ্যনাথের বুকটা ছ্যাঁত করিয়া উঠিল। স্বচক্ষে সে যাহাই দেখিয়া ফিরিয়া আসুক, মলিনার কাছে সে-কাহিনী বলিলে তাহার লাঞ্ছনার যে অবধি থাকবে না, এ-কথা সে অনেক আগেই জানে। না, আত্মসম্মান বজায় থাকে, ফিরিয়া আসিবার এমন একটা সঙ্গত কারণ তাহার বাহির করিতেই হইবে।

মলিনার কথার উত্তরে প্রথমটা সে বোকার মত একটু হাসিল। মলিনা আবার বলিল, "বীরপুরুষ, হাঁপাচ্ছ যে বড় !"

আদ্যনাথ বলিল, "তোমরাও ত দেখি ফোঁপাচ্ছ।"

"বাঃ, এই যে মুখে কথা ফুটেছে ! কিন্তু ছেলেমানুষকে এই রকম করে ভয় দেখানোতে কি বাহাদুরি আছে বাপু ? ও ত কেঁদেই সারা ! আমি যত বলি, 'কক্ষনো চলে যায়নি দেখ, এক্ষুনি আসবে।'—ওর কান্না কি থামে ?"

বলা বাহুল্য অকূলে কূল পাইয়া তাহার চলিয়া যাওয়ার এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করিতে আন্তনাথ বিন্দুমাত্র বিলম্ব করিল না। মনে মনে অদূর ভবিষ্যতে মলিনা মেয়েটি সম্বন্ধে তাহার মতামত যথাসম্ভব সংশোধন করিবে এমন একটা সঙ্কল্পও সে করিয়া বসিল। দরজার খিলটা ভাল করিয়া দেওয়া হইয়াছে কিনা আর একবার দেখিয়া তাহার পর সে প্রসন্ন মনে বিছানার ধারে গিয়া বসিল।

সেই এক রাত্রে স্বামী-স্ত্রীর কী আলাপ হইয়াছিল বলিতে পারি না, কিন্তু দেখা গেল তাহার পরের দিনও আদ্যনাথের

কলিকাতায় যাইবার বিশেষ তাড়া নাই। ইহার পরের দিনও আদ্যনাথকে গৌহাটি ত্যাগ না করিতে দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইলাম। এবং নীলিমা মাত্র বোধোদয় পর্যন্ত পড়িয়া কী করিয়া আদ্যনাথের কল্পনালোকের মানসীকে হার মানাইল তাহা আমাদের সহজ বুদ্ধির অতীত।

সব চেয়ে আশ্চর্যের কথা এই যে, এই ক'দিনে তাহার নিজের খবরের কাগজটা খুলিয়া পড়িবার উৎসাহও আদ্যনাথের হয় নাই।

তাহাদের দাম্পত্যজীবনের বিরোধ ঘুচাইবার জন্য যে মহাপ্রাণ ব্যাঘ্র জঙ্গল ছাড়িয়া লোকালয়ে আসিয়া প্রাণ বিসর্জন দিল, তাহাকে সে নিজের বিকৃত কল্পনাপ্রসূত কল্যাণকর বিভীষিকা বলিয়াই আজও জানে।

চুরি

প্যারীমোহনবাবু আবার মোড়ের পানের দোকানটায় ফিরে চললেন। সকাল থেকে হাঁটাহাঁটি বড় বেশী হয়েছে, কোমরের ব্যথাটাও বেড়েছে। জলকাদার ভিতর এতখানি রাস্তা আবার ফিরে যেতে অত্যন্ত কষ্টই হবে, তবু না গিয়ে তাঁর উপায় নেই। একবার অবশ্য মনে হয়েছিল পয়সা দুটো রাস্তার কোন গরিব ভিখিরীকে দিয়ে দিলেই হ্যাঙ্গাম চুকে যায়। কিন্তু বিবেকের দংশন তাতে শান্ত হয় না। এ দুপয়সা দান করার অধিকার ত তাঁর নেই। দোকানদার পয়সা ফেরত দেবার সময় ভাল করে না গুনেই পকেটে রেখেছিলেন। এইমাত্র বিড়ি বার করতে গিয়ে পয়সাগুলোর হিসেব করে তার ভুল ধরতে পেরেছেন।

দোকানদার অবশ্য প্যারীমোহনবাবুকে চিনতেই পারল না। প্যারীমোহনবাবুকেই বুঝিয়ে দিতে হল যে, খানিক আগে তিনি তার দোকান থেকে দুপয়সার বিড়ি কিনেছেন, এবং সে-বিড়ির দাম দেবার জন্যে যে দোয়ানিটি দিয়েছেন, দোকানদার তার ভাঙানি ফেরত দিতে ভুল করেছে।

ভুল শুনেই দোকানদারের মেজাজ গরম হয়ে উঠল। খেঁকিয়ে উঠে বললে, "ক্যা ভুল হুয়া? দো পয়সাকে বিড়ি লেকে দো ঘণ্টা বাদ ভুল দেখানে আয়া!"

অত্যন্ত অপমানিত বোধ করলেও প্যারীমোহনবাবুকে এবার ধৈর্য ধরে বুঝিয়ে দিতে হল যে, তিনি দোকানদারের কাছে কিছু

দাবি করতে আসেননি, এসেছেন যে-দুপয়সা সে ভুল করে বেশী দিয়েছিল, তাই ফেরত দিতে।

দোকানদারের উগ্রতাটা একটু শান্ত হল কিন্তু কণ্ঠস্বর বিশেষ মোলায়েম হয়েছে মনে হল না। কাঁচা-পাকা খোঁচা-খোঁচা দাড়ি-ওঠা, মাথার মাঝখানে অত্যন্ত বেমানান ভাবে টাক পড়া—ছেঁড়া কোট, তালি দেওয়া কাপড় পরনে, ভাঙা ছাতি হাতে এই মাঝবয়সী মানুষটিকে অদ্ভুত কোন জীববিশেষ হিসেবেই একটুখানি লক্ষ্য করে দোকানদার তাচ্ছিল্যভরে বললে, "তব দিজিয়ে!"

প্যারীমোহনবাবু পয়সা দুটো তার হাতে দিতে, নিতান্ত অবহেলা ভরে একটা টিনের কৌটায় সেটা ফেলে, সে আবার জাল-বসান আগুনটার উপর বিড়ির বাণ্ডিলগুলো সেঁকার জন্যে সাজাতে লাগল। প্যারীমোহনবাবুর দিকে তার আর ভ্রূক্ষেপ নেই।

প্যারীমোহনবাবু আবার বাড়ি যাবার পথ ধরলেন। আপনা থেকে পয়সা ফেরত দিতে গিয়ে দোকানদারের যে করুণামিশ্রিত অবজ্ঞাটুকু পেলেন, তাতে আহত না হবার মত অসাড় এখনও তিনি হননি, কিন্তু তবু এধরনের অবজ্ঞা অনেকটা এখন সয়ে গিয়েছে। সাধারণত মানুষের কাছে অবজ্ঞাই এখন তিনি পেয়ে থাকেন, সে-অবজ্ঞা করুণা বা সদয় সহানুভূতির আবরণে বরং আরও তিক্তই লাগে।

আজ রাখাল দফাদারের গদিতে যেমন হয়েছে। রাখাল তাঁর বহু পুরাতন ছাত্র। যৌবনে শিক্ষাদানের সুমহৎ আদর্শ সামনে রেখে যখন প্রথম স্কুলমাষ্টারিতে ঢুকেছিলেন, তখন গোড়ায় পাঁচ ছয় বছরে যে-সব ছাত্র তাঁর হাত দিয়ে পার হয়েছে, রাখাল তাদের মধ্যে একজন। ছাত্র হিসেবে মোটেই ভাল ছিল না, তার উপর শয়তানী বুদ্ধিতে ছিল পাকা। ক্লাসে পাঁচটা হোম-টাস্কের বদলে

ছুটো অঙ্কই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে লিখে পাঁচটা বলে চালাবার চেষ্টা, পরীক্ষায় লুকিয়ে বই নিয়ে গিয়ে বা পরের খাতা দেখে টোকবার বদমায়েসির জন্যে প্যারীমোহনবাবুর কাছে অনেক বকুনি, ধমক, কানমলা, চড় সে খেয়েছে। প্যারীমোহনবাবু চিরকাল অত্যন্ত সিধে কড়া মাষ্টার বলে পরিচিত। ছেলেদের পড়াবার জন্যে তিনি চিরদিন প্রাণপাত করে এসেছেন, কিন্তু তাঁর কাছে কোন ফাঁকি মিথ্যার এতটুকু প্রশ্রয় নেই। অন্যায় দেখলে তিনি বজ্রের মত কঠিন। প্যারীমোহনবাবুকে হাত করবার জন্যে কিনা বলা যায় না, রাখাল বাড়িতে বলে বুঝিয়ে তাঁকে তার বাড়ির মাষ্টার হিসেবে রাখবার ব্যবস্থা করেছে। তারই দরুন বিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষার বেড়া সে কোন রকমে টপকে পার হয়েছে বটে কিন্তু আর কিছু সুবিধা পায়নি। প্যারীবাবুকে দাম দিয়ে কেনা যায় না।

রাখালের প্যারীবাবুর প্রতি অনুরাগ বা শ্রদ্ধা না থাক কৃতজ্ঞতাটুকু ছিল। পরবর্তী জীবনে নিজের ছেলেকে পড়াবার ভার সে আপনা থেকে ডেকে পাঠিয়ে প্যারীবাবুর উপরেই ছেড়ে দিয়েছে। রাখালের ছেলে প্যারীবাবুর স্কুলে পড়ে না, প্যারীবাবুর স্কুলকে কানা করে, শ খানেক গজ দূরে বড় রাস্তার উপর যে নতুন শৌখিন বড়লোকদের ছেলেদের অনেক বেশী মাইনের স্কুল কিছুদিন হল বসেছে, তার সে ছাত্র। তবু রাখাল প্যারীবাবুকে খাতির করে ডেকে পাঠিয়ে বলেছে, "আপনার হাতে পড়েও আমি ত আর মানুষ হলাম না, দেখুন আমার ছেলেটাকে যদি পারেন।" রাখাল তখন থেকেই ওই রকম আধা-মুরুব্বিয়ানা আধা-সম্মানের সুরে কথা বলে।

প্যারীবাবু সে-সময়ে কাজটা পেয়ে অবশ্য বেঁচে গিয়েছিলেন। তাঁর দৈন্যদশা তখন থেকেই শুরু হয়েছে। পাড়ায় শৌখিন নতুন

স্কুলটি হওয়ার দরুন তাঁদের স্কুলের অবস্থা অত্যন্ত কাহিল। নতুন স্কুলের প্রকাণ্ড জমকালো বাড়ি, তার ধরনধারণ চালচলন সবই উঁচু দরের। তাঁদের ভাঙা পুরনো একতলা বাড়ির সেকেলে স্কুলে নেহাত নিরুপায় না হয়ে কেউ আর ছেলে পাঠায় না। স্কুল উঠে যাবার সম্ভাবনার ভয় দেখিয়ে সেক্রেটারি মশাই সব শিক্ষকেরই মাইনে কমিয়ে দিয়েছেন। ওদিকে দিনকাল তখন থেকেই খারাপ। ছেলেমেয়ে নিয়ে প্যারীবাবুর সংসারও তখন বেশ বৃহৎ হয়ে উঠেছে। ছোট বড় সাতটি মানুষের দুবেলার অন্ন প্রতিদিন জোগাতে হয়।

রাখালের ছেলেও যথাসময়ে এই সেদিন স্কুলের গণ্ডী পার হয়ে গিয়েছে। তারই কিছু আগে পৃথিবীময় যুদ্ধ বেধেছে ও প্যারীবাবুর দুর্দশা চরম সীমায় গিয়ে পেঁছেছে। টিউশনি ও মাষ্টারির আয়ে আগে কোন রকমে লজ্জা নিবারণ করে শাক-ভাতের সংস্থান হত। লজ্জা নিবারণ দূরের কথা, বাড়ি ভাড়া দিয়ে এখন তাতে শাকটুকুর উপর ভাতের ব্যবস্থা করতেই কুলয় না।

প্যারীবাবু অনেক ইতস্তত করে, নিজের মনের সঙ্গে অনেক বোঝাপড়ার পর আজ একটি বিশেষ আর্জি নিয়েই রাখালের কাছে গিয়েছিলেন। রাখাল এখন মস্ত ব্যবসাদার। তার ইটসুরকির পৈতৃক কারবার যুদ্ধের বাজারের মিলিটারি কন্‌ট্র্যাক্টের দৌলতে রাতারাতি ফেঁপে উঠেছে। দশ-বিশটা লরি সারাক্ষণ তার আড়তে আসছে যাচ্ছে, নদীর ঘাটে টালি বালির ভরা দাঁড়াবার জায়গা পাচ্ছে না।

দাঁড়াবার জায়গা তার গদিতেও নেই। বাড়িতে গিয়ে দেখা পাওয়া দুষ্কর বলে প্যারীবাবু রাখালের গদিতেই এসেছিলেন সকাল বেলা। ইট-সুরকির ব্যবসা হলে কী হয়, রাখালের গদিতে এখন সাহেবী ব্যবস্থা। বাইরে সাবেকী কায়দায় খাতা পত্র বাক্স নিয়ে তার সরকার ইত্যাদি বসে, বাছাই করা ধনী মানী খদ্দেরদের খাতির

করবার জন্যে রাখালের ভিতরে আলাদা হালফ্যাশনের অফিস-ঘর। খবর না পাঠিয়ে সেখানে ঢোকা যায় না।

প্যারীবাবু অনেকক্ষণ ধরে ভিতরে খবর দেবার চেষ্টা করেছেন, কেউ তাঁকে গ্রাহ্য করেনি। অবশেষে বিরক্ত হয়ে একজন সরকার বলেছে, "বলুন মশাই, কী বলতে হবে গিয়ে। দেখছেন কী রকম কাজের ভিড়, নিঃশ্বাস ফেলবার কারু ফুরসুত নেই। এর ভেতর যত বাজে ফাই-ফরমাজ! কাজ কারবার ছাড়া যদি দেখা করতে চান ত বাবুর বাড়ি গেলেই পারেন। এটা ত বৈঠকখানা নয়, ব্যবসার জায়গা!"

প্যারীবাবু শান্ত ভাবে বলেছেন, "বাড়ি গিয়ে দেখা হয়নি বলেই এখানে এসেছি। আপনি শুধু একটু গিয়ে খবর দিন যে, প্যারীবাবু এসেছেন। যদি তাঁর দেখা করবার সময় না থাকে, আমি চলে যাব।"

প্যারীবাবুর দিকে একবার ভ্রূকুটি করে সরকার ভিতরে গেল খবর দিতে।

খবর পেয়ে কিন্তু রাখাল যে-ভাবে নিজে বেরিয়ে এসে অভ্যর্থনা করেছে, তাতে আর কেউ হলে বেশ একটু গর্বই বোধ করত। "আরে মাষ্টার মশাই যে! আপনি এসে এখানে দাঁড়িয়ে আছেন, কী লজ্জার কথা। আপনার আবার খবর দেওয়া-দেওয়ি কী! সটান অফিসে চলে আসবেন। আসুন আসুন।"

কাটা দরজাটা সে নিজেই ফাঁক করে ধরেছে মাষ্টার মশাইএর যাওয়ার সুবিধে করে দেবার জন্যে।

প্যারীবাবু ছাতিটি হাতে নিয়ে ভিতরে ঢুকেছেন। অফিসঘরের মেঝেতে কার্পেট পাতা। প্যারীবাবুর কাছে সেটা অত্যন্ত দামী মনে হয়েছে। কাদা মাখা ছেঁড়া জুতোয় সে-কার্পেট মাড়িয়ে মোটা গদি আঁটা ঝকঝকে চেয়ারে তাঁর ময়লা ছেঁড়া পোশাক

নিয়ে গিয়ে বেশ একটু সঙ্কোচই তাঁর হয়েছে। ঘরে আরও একজন আছে, তিনি ভাবেননি। ফিটফাট সাহেবী পোশাক পরা, এই সব আসবাবপত্রের সঙ্গে মানানসই এক ভদ্রলোক। তাঁর সঙ্গে নিজের পরিচ্ছদটা তুলনা করেই প্যারীবাবুর সঙ্কোচ হয়েছে বেশী। কিন্তু এ-সঙ্কোচ ত ক্ষণিকের। এ-সঙ্কোচকে আমল দিলে আজকের দিনে পথেঘাটে লোকসমাজে তাঁর বেরুনই বন্ধ করতে হয়। প্যারীবাবু তাই মন থেকে এটা সরিয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু রাখালই তার বদান্যতার আতিশয্যে বাদ সেধেছে। সগর্বে বেশ একটু অনুকম্পামিশ্রিত সম্মানের সঙ্গে ঘরের অপর ব্যক্তিকে সম্বোধন করে বলেছে, "তোমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই, সেন— আমার মাষ্টার মশাই—ছেলেবেলায় আমায় পড়িয়েছেন,—মানে গাধা পিটে মানুষ করেছেন আর কি!" নিজের উদারতা ও বিনয়ে নিজে মুগ্ধ হয়ে রাখাল হেসেছে।

সেন, কলের পুতুলের মত কেতাদুরস্ত ভাবে জ্যামিতিক সরল রেখায় ঘাড় ফিরিয়ে চেয়ার ছেড়ে একটু উঠবার ভঙ্গি করে হাত দুটো গলা পর্যন্ত তুলেছে, প্যারীবাবুও নমস্কার করেছেন। মাথা না নেড়ে কী করে শুধু চোখের তারা ওঠা-নামার কৌশলে কারও আপাদমস্তক সমালোচনা করা যায়, সেনের দৃষ্টি থেকে প্যারীবাবু প্রথম বুঝতে পেরেছেন। রাখাল তখন সোৎসাহে বলে চলেছে, "ওঁর এই চেহারা দেখে ভাবতেই পারবে না কী ভয়টা ওঁকে আমরা করতাম। ঠিক বাঘের মত। চড়চাপড় কানমলা কত যে খেয়েছি!"

দাঁত না বার করে শুধু ঠোঁটদুটো একটু বিস্তৃত করে কী করে দায়সারা হাসি হাসা যায়, সেনের মুখ দেখে প্যারীবাবু এবার শিখেছেন। এবার তাঁর সত্যিই অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ হয়েছে। কোন রকমে দরকারী কথাটা সেরে ফেলে যেতে পারলে তিনি

বাঁচেন। বলেছেন, "তোমার সময় নষ্ট করতে চাইনা রাখাল, আমার শুধু একটা কথা ছিল···"

রাখাল বাধা দিয়ে বলেছে, "আরে বস্থন বস্থন মাষ্টারমশাই। গদিতে পায়ের ধুলো যখন দিয়েছেন, তখন অমনি কি আর ছাড়ি।"

ছাড়তে সে সত্যিই চায় না। নেহাত কবে কোন যুগে ছেলেবেলায় পড়িয়েছেন বলে জীবন-যুদ্ধের এমন পরাস্ত লবেজান সৈনিককে মনে রেখে খাতির দেখানর মধ্যে যে কতখানি উদারতা ও মহত্ত্ব আছে, তা বোঝাবার এমন সুযোগ সে ছাড়তে পারে! তার অবস্থার আর কেউ হলে এমন চেহারা ও পোশাকের কোন কোন লোককে আমলই যে দিত না, আর সে যে সেই লোকটিকে রীতিমত সশ্রদ্ধভাবে আপ্যায়িত করছে, এমন একটা বাহাদুরি নেবার সুবিধে প্রতিদিন ত হয় না। পান সিগারেট আনিয়ে নানাভাবে খাতির করে সে প্যারীবাবুকে ব্যতিব্যস্তই করে তুলেছে। খানিক বাদে বলেছে "আপনার চেহারা কিন্তু বড় খারাপ হয়ে গেছে মাষ্টারমশাই। কী ক্ষমতাই না আপনার গায়ে ছিল তখন ত দেখেছি। আর চেহারা খারাপ হবে না-ই বা কেন! বুঝেছ সেন, আজকালকার দিনে যে যা পারে লুটে নিচ্ছে, সবাই আঙুল ফুলে কলাগাছ, শুধু বেচারা মাষ্টারদেরই কপাল পুড়ে ছাই হয়েছে। সব কিছুর দর অমন তিনগুণ চারগুণ চড়া, কিন্তু এঁদের মাইনে কমেছে বই বাড়েনি। কী করে তাতে চলে, বলতে পার?"

একটু থেমে অনুকম্পার আতিশয্যে প্যারীবাবুকে রাখাল হঠাৎ জিজ্ঞাসা করেছে, "আচ্ছা, স্কুলে এখন কত মাইনে পান মাষ্টার-মশাই?"

প্যারীবাবু অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করেছেন—পিন্-ফোটান পোকাকে যেন অণুবীক্ষণের কাঁচের তলায় ধরা হয়েছে। তবু বাধ্য হয়ে বলেছেন, "ষাট টাকা পাই।"

"ষাট টাকা! তাও ত আপনি খুব বেশী পান। এই ষাটের ওপর টিউশনি ইত্যাদি সব মিলিয়ে ধরলুম একশ টাকা আয়! ভেবে দেখ সেন। একশ টাকায় একটা মানুষের আজকাল চলে না, একটা গোটা সংসার! একটা রিকশাওয়ালা দিন আজকাল কত রোজগার করে জান ত? অন্তত চার টাকা। তবু তাদের লোকলৌকিকতা নেই, ভদ্র সেজে থাকবার দায় নেই…"

সেন এবার বোধহয় এই একঘেয়ে আলোচনা আর সহ্য করতে না পেরেই বিদায় নিয়েছে। রাখাল, শ্রোতা ও দর্শকের অভাবে একটু নিরুৎসাহ হয়ে পড়ে জিজ্ঞাসা করেছে, "তার পর বলুন মাষ্টারমশাই, কী জন্যে পায়ের ধুলো দিয়েছেন!"

প্যারীবাবু সমস্ত সঙ্কোচ কোনরকমে জয় করে কথাগুলো বলেছেন। রাখালের ছেলে এখন আর স্কুলে পড়ে না, তবু তার অঙ্কের টিউশনিটা প্যারীবাবুকে দিলে তিনি করতে পারেন। আর কিছু না হক কলেজের অঙ্ক শেখাবার মত বিদ্যা তাঁর আছে, রাখাল ত জানে। রাখাল ছেলেকে পড়াবার বিশেষ বিশেষ বিষয়ের জন্যে আলাদা টিউটর রাখবার ব্যবস্থা করেছে জেনেই কথাটা তাঁর মনে হয়েছে।

রাখাল বেশ একটু গর্বের সঙ্গে বলেছে, "না রেখে আর কী করি বলুন, আমারই ত ছেলে। নিজের মুরোদ যে ওর কত তা ত আমার জানতে বাকী নেই। এই দেখুন না, একজন ইংরেজীর, একজন লজিকের ত এর মধ্যেই এসে জুটেছেন, অঙ্কেরও একজন না রাখলে নয়!"

প্যারীবাবু আশান্বিত হয়ে বলেছেন, "সেই জন্যেই তোমার সঙ্গে দেখা করতে এলাম।"

"তা বেশ করেছেন, আপনি হলে ত ভালই হয়।" রাখাল হঠাৎ যেন একটু চিন্তিত ভাবে বলেছে, "তবে কি জানেন, স্কুল থেকে

কলেজে ঢুকলেই ছেলেদের মাথাগুলো একটু গরম হয়ে যায় কিনা। স্কুলের মাষ্টারদের তখন মনে করে—ওই কি বলে, 'ওল্ড ফসিল্‌স্‌,' কলেজের প্রফেসারের কাছে না পড়লে বাবুদের তখন মান থাকে না। আচ্ছা, তবু আমি বুঝিয়ে বলে দেখব'খন। আপনি বরং খোঁজ নেবেন এর মধ্যে একদিন।"

প্যারীবাবু আর কিছু না বলে উঠে পড়েছেন এবার। তাঁর মত অবস্থা হলে আর কেউ বোধ হয় আর একবার পীড়াপিড়ি করত, কিন্তু তাঁর দ্বারা তা সম্ভব নয়।

রাখালও তাঁর সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে হঠাৎ আবার সহৃদয়তায় গলে গিয়ে বলেছে, "আমি বলি কি, মাষ্টারমশাই, এ লাইনটাই ছেড়ে দিতে পারেন না? সারাজীবন মাষ্টারি করে ত দেখলেন, জাতও গেল পেটও ভরল না। আমাদেরই শশাঙ্কবাবু, স্কুল ছেড়ে চোরাবাজারে ঢুকে কী রকম ফেঁপে উঠেছেন জানেন ত! পুকুরকে পুকুর চুরি করে মেরে দিচ্ছেন। মাষ্টারি নিয়ে পড়ে থাকলে কী আর হত! উপোস করে দিন যেত ত! আপনি যদি রাজী থাকেন ত বলুন, আমি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। এই সেনেরই একজন লোক দরকার, বলছিল, কেয়াতলা না কোথায় ওর বাইরের কাজ দেখবার জন্যে। একটু সুবিধেমাফিক চোখ দুটো বুজিয়ে রেখে হাত বাড়াতে পারলে দেখবেন, হাত মুঠো করতে পারছেন না—লক্ষ্মী হাত উপছে পড়ছে।"

প্যারীবাবুকে চুপ করে থাকতে দেখে একটু হেসে রাখাল আবার নিজে থেকেই বলেছে, "আপনার কী মনে হচ্ছে, বেশ বুঝতে পারছি। কান দুটো আমার মলে দিয়ে আবার বেঞ্চির ওপর দাঁড় করিয়ে দিতে ইচ্ছে হচ্ছে, কেমন না? কী বলব বলুন, এই রোগেই ত আপনারা মারা যাচ্ছেন। শয়তানের রাজ্যে টিঁকে থাকতে হলে শয়তানি না করে উপায় নেই, এই সোজা কথাটা আপনারা কিছুতেই বুঝবেন না।"

প্যারীবাবু গম্ভীর ভাবে বলেছেন, "আমি তাহলে আসছে রবিবার আসব।"

"বেশ, তা-ই আসবেন।" বলে রাখাল তাঁকে এবারেও দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে সসম্মানে নমস্কার করে বিদায় দিয়েছে।

প্যারীবাবু ক্লান্তদেহে যখন বাড়ি ঢুকলেন তখন বেশ বেলা হয়ে গিয়েছে। অনেকখানি রাস্তা হেঁটে যেতে হবে বলে, সকাল বেলা কিছু মুখে না দিয়েই তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়েছিলেন। ক্লান্ত হয়ে ফিরে এসে ইচ্ছে ছিল একটু চা খাবার। কিন্তু রবিবার বলে উনুনে এখনও আঁচ পড়েনি। কয়লার যা দাম, তাতে বুঝেশুঝে উনুন ধরাতে হয়। দুবেলা উনুন ধরাবার দরকারই থাকে না অনেকদিন, রাঁধবার জিনিসের অভাবে। অভাব যেদিন থাকে না, সেদিনও প্যারীবাবুর স্ত্রী হেমলতা একবেলার বেশী আগুন জ্বালেন না। দুবেলা রান্না করার বিলাসিতা করবার মত অবস্থা তাঁদের অনেক দিন ঘুচে গেছে।

গলির মধ্যে একটি অত্যন্ত পুরানো জীর্ণ দোতালা বাড়ির নীচের দুটি অন্ধকার স্যাঁতসেতে ঘর প্যারীবাবু আজ বিশ বছর ধরে ভাড়া করে আছেন। বিশ বছরের মধ্যে কোনদিন সে-বাড়ির সংস্কার হয়েছে কিনা সন্দেহ। দেয়ালে হাত লাগলে চুনবালি ঝরঝর করে খসে পড়ে, জানালা দরজাগুলো এমন নড়বড়ে যে, মনে হয় খুলতে বন্ধ করতেই কোন দিন দেয়াল থেকে আলগা হয়ে আসবে। ঘর দুটির সামনে সঙ্কীর্ণ একটি রকের একদিক দরমা ও চটে ঘিরে রান্নার জায়গা করা হয়েছে, আর একদিকে একটি ভাঙা তক্তপোষ পাতা আছে। সেইটেই প্যারীবাবুর বৈঠকখানা ও সময় পেলে বিশ্রামের জায়গা।

প্যারীবাবু ছাতাটি দেয়ালের ধারে রেখে ক্লান্ত ভাবে সেই তক্ত-পোষের উপর এসে বসেন। হেমলতা রান্নাঘরের পাশে এক বালতি

জল দিয়ে বাড়ির ছিন্ন ময়লা কাপড়চোপড় সাবান দিয়ে যথাসম্ভব পরিষ্কার করবার চেষ্টা করছেন। স্বামীকে দেখে অভ্যাসের দরুন সাবান-মাখা হাতের কনুই দিয়ে মাথায় শাড়ির একটা প্রান্ত তুলে দেবার ব্যর্থ চেষ্টা করে হাঁক দেন, "অ উমা, তোর বাবাকে রান্নাঘরের পাখাটা দিয়ে যা ত!"

প্যারীবাবু কোঁচার খুঁট দিয়ে মুখ মুছছিলেন। মেজ মেয়ে উমা এসে পাখাটা দেবার সময় তিনি অবাক হয়ে তার দিকে খানিক তাকিয়ে থাকেন। উমা চলে যাবার পর অবাক হবার কারণটা যেন তাঁর হৃদয়ঙ্গম হয়। স্ত্রীকে ডেকে বলেন, "এদিকে একটু শোন।"

"কাপড় কাচচি দেখতে পাচ্ছ না। বল না ওইখান থেকেই!"

প্যারীবাবু গম্ভীরস্বরে বলেন, "না, এইখানে শুনে যাও।"

এ-গলার স্বর অমান্য করা যায় না। হেমলতা সাবান-মাখা হাতেই উঠে এসে বলেন, "বল, কী বলছ!"

তীব্র দৃষ্টিতে স্ত্রীর দিকে চেয়ে প্যারীবাবু বলেন, "উমা নতুন একটা শাড়ি পরেছে দেখলাম!"

"হ্যাঁ পরেছে তা হয়েছে কী। মেয়েদের কি নতুন শাড়ি পরতে নেই।"

"পরতে আছে, কিন্তু শাড়ি এল কোথা থেকে?"

"কাল ওর জন্মদিন ছিল, তাই পেয়েছে।"

প্যারীবাবু কিছুক্ষণের জন্যে স্তম্ভিত হয়েই বুঝি কথা বলতে পারেন না। এ বাড়িতে কারও জন্মান এমন একটা সৌভাগ্য নয় যে ঘটা করে এ পর্যন্ত কোনদিন তা স্মরণ করবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। খানিক বাদে কঠিন স্বরে তিনি জিজ্ঞাসা করেন, "কে দিয়েছে?"

"পুলিনবাবু দিয়েছে। নাও হ'ল ত। মেয়ে একটা নতুন

শাড়ি পরেছে, তার জবাবদিহি দিতে দিতে জান গেল।” হেমলতা আবার তাঁর কাপড় কাচার জায়গায় ফিরে যান। নিজের মনের কোন একটা সঙ্কোচ ঢাকবার জন্যেই তাঁর কণ্ঠে যে এই অতিরিক্ত ঝঙ্কার তা কিন্তু বুঝতে বাকী থাকে না।

প্যারীবাবু স্তব্ধ হয়ে বসে থাকেন। পুলিনবাবু শাড়ি দিয়েছে। বছর খানেক আগে তাঁর স্ত্রীই এই পুলিনবাবুর সম্পর্কে কী বলেছিলেন স্পষ্ট তাঁর মনে আছে। বেশ একটু রাগের সঙ্গেই হেমলতা সেদিন জানিয়েছিলেন, “দেখ, ওই পুলিনবাবু লোকটির ধরনধারণ আমার ভাল লাগছে না কিন্তু।”

“পুলিনবাবু আবার কে ?” প্রথমটা বুঝতে না পেরে প্যারীবাবু জিজ্ঞাসা করেছিলেন।

“ওই যে গলির মোড়ের বড় বাড়িটা যাদের—চেন না!”

চিনতে পেরে প্যারীবাবু অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, “হাঁ, কী করেছে সে ?”

“করেনি কিছু, কিন্তু ওরা হল বড়লোক, আমাদের মত গরিব দুঃখীর সঙ্গে অমন গায়ে পড়ে আলাপ করার অত গরজ ওদের কিসের! নেপুর সঙ্গে ভাব করে প্রথম একদিন বাড়িতে এল, তারপর আজকাল যখন-তখন হামেশাই ত আসছে। ‘কেমন আছেন মাসিমা।’ ‘এই একটু ঘুরে গেলাম মাসিমা’—আমি যেন ওর কোনকেলে কেনা মাসিমা।”

“তা মাসিমা বললে দোষটা কী ?”

“দোষটা কী বুঝতে পার না! উমা যে বড় হয়েছে সে-খেয়াল আছে ? লোকটির স্বভাবচরিত্র জানতে পাড়ায় ত কারুর বাকী নেই। স্ত্রীকে মেরেধরেই বাড়ি থেকে বার করে দিয়েছে, না মনের দুঃখে সে নিজেই বিদেয় হয়ে গিয়েছে কেউ জানে না। আমাদের ওপর অত দরদ ওর কিসের ? সেদিন বলে কিনা, ‘উমার যা মিষ্টি

গলা, আমি ওকে গান শেখাব মাসিমা!' আমিও বললাম, 'আমাদের মত গরিবের ঘরের মেয়েরা রেঁধেবেড়ে বাসন মেজে চুল বাঁধবারই সময় পায় না, গান শিখে তাদের কী হবে।' বললে হবে কী, লজ্জা ত নেই, বেহায়ার মত আবার তবু আসে।"

পুলিনবাবু যে তবু আসে প্যারীবাবু তা সবসময়ে চোখে না দেখলেও জানেন। কিন্তু উমাকে জন্মদিনের নামে তার শাড়ি দেওয়া পর্যন্ত যে হেমলতার প্রশ্রয় পেতে পারে এতটা তিনি ভাবতে পারেননি। গোড়ায় গোড়ায় ছেলেমেয়েরা পুলিনবাবুর সঙ্গে বায়স্কোপ থিয়েটারে যাবার জন্যে তাঁর কাছে অনুমতি চাইতে এসেছে। নিজে থেকে কোন উৎসব আনন্দের সুযোগ দেবার ক্ষমতা নেই বলেই তাদের আশাভঙ্গ করতে তিনি পারেননি। আজকাল অনুমতি নিতে কেউ আসে না। পুলিনবাবুর সঙ্গে যাওয়া বন্ধ হয়েছে বলে নয়, এ-বাড়ির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা তার এত বেড়েছে যে অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন আর কেউ অনুভব করে না।

প্যারীবাবু সরল ও সত্যাশ্রয়ী বলে নির্বোধ নন। শুধু এতদিন তাঁর দৃষ্টি নিজের দুশ্চিন্তার মধ্যে মগ্ন হয়ে ছিল। এ-ঘনিষ্ঠতার আসল চেহারা আজ এই শাড়িটির সাহায্যে তার সমস্ত জঘন্যতা নিয়ে তাঁর কাছে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। এই জীর্ণ বাড়িটার সমস্ত শ্রী ও শালীনতার আবরণ যেমন ধীরে ধীরে খসে যাচ্ছে, তার দুর্বল ইঁটগুলো যেমন নোনাধরার বিষক্রিয়া ঠেকাতে না পেরে ঝাঁঝরা হয়ে যাচ্ছে, দারিদ্র্যে জীর্ণ তাঁর সংসারেরও সেই পরিণাম তিনি চোখের ওপর দেখতে পান। অভাবের ছিদ্রপথে কলুষ ও গ্লানি এ-সংসারকে ধীরে ধীরে গ্রাস করছে।

অভিভূত স্তব্ধ হয়ে বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ একটা গোলমালে তাঁর চমক ভাঙে। বড় ছেলে দেবু সব চেয়ে ছোট নেপুকে কান ধরে বাইরে থেকে নিয়ে এসে হেমলতার কাছে ক্রুদ্ধ

স্বরে বলছে, "শোন মা তোমার ছোট ছেলের কীর্তি। উনি চুরি বিদ্যেতে পর্যন্ত পাকা হয়েছেন। পাশের বাড়িতে বন্ধুর সঙ্গে পড়ার বই আনবার ছুতো করে গিয়ে ঘরের দেরাজের ওপর থেকে..."

হেমলতারই নিঃশব্দ ইঙ্গিতে বাবার উপস্থিতি টের পেয়ে দেবু হঠাৎ চুপ করে যায়। প্যারীবাবুর মাথায় তখন কিন্তু আগুন জ্বলে উঠেছে। পাখাটা হাতে নিয়ে কাঁপতে কাঁপতে তিনি সেখানে গিয়ে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে জিজ্ঞাসা করেন, "কী চুরি করেছে নেপু? কী চুরি করেছে?"

তাঁর এমন চেহারা হেমলতা জীবনে কখনও দেখেননি। তিনি ভয়ে কাঠ হয়ে বসে থাকেন। দেবু ও নেপু দুজনের কারও মুখ দিয়েই কথা বার হয় না।

"বল কী চুরি করেছিস্?" বলে প্যারীবাবু পাখার বাঁটটা তোলেন। কিন্তু নেপুর গায়ে তার আঘাত আর পড়ে না। হাত তুলেও খানিকক্ষণ কেমন অদ্ভুত ভাবে নেপুর দিকে তাকিয়ে থেকে ধীরে ধীরে পাখাটা তিনি নামিয়ে নেন। তারপর পাখাটা সেইখানে ফেলে দিয়ে দেওয়ালে ঠেস-রাখা ছাতাটা হাতে নিয়ে কোন দিকে না চেয়ে তিনি বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান।

পিস্তল

ছেলেগুলো আজ-কাল দু-চারটে ইংরিজী কথা শিখে ফেলেছে। 'ইয়েস' 'নো' শুধু নয়, 'ভেরি হাংরি সাব', 'নো ফুড টু ডেজ্ সাব', 'ওনলি টু পাইস্ সাব!' তারা বেশ গড়্-গড়্ করে বলতে পারে। ইংরেজ মার্কিনের তফাত পর্যন্ত তারা বোঝে। বলে, 'ইউ ম্যারিক্যান সার। ম্যারিক্যান ভেরি গুড্, ব্রিটিশ ভেরি পুওর।' আবার ইংরেজ দেখলে বলে, 'ব্রিটিশ ভেরি বোল্ড সার—ব্রিটিশ ফাইট্।' শুনে সৈনিকদের কেউ কেউ হাসে, কেউ কেউ দু আনা চার আনা ছুঁড়ে দেয়, আবার কেউ বুট তোলে। ছেলেগুলো খিল-খিল করে হেসে প্ল্যাটফর্মের আর এক প্রান্তে সরে পড়ে।

ছোট একটা জংশন-স্টেশন। আগে দু-চারটে ট্রেন দিন-রাতের মধ্যে পার করে বিশাল প্রান্তরের মধ্যে সারাক্ষণ ঝিমোত।

যুদ্ধের বাজারে মিলিটারী কণ্ট্রাক্টরের মত হঠাৎ ফেঁপে-ফুলে একেবারে রাতারাতি চেহারা বদলে গেছে। প্ল্যাটফর্মে ট্রেন দাঁড়ালে, স্টেশনের পুব দিকে যে পাথুরে ঢিবিটা এত দিন দিগন্ত আড়াল করে থাকত, ফতেচাঁদ সিঙ্ঘির হাজার কুলি-কামিন ছ-মাসের মধ্যে গাঁইতি কোদাল শাবলে সেটা নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে সেখানে তিন তিনটে সাইডিং বানিয়ে ফেলেছে। পশ্চিমের পাথুরে বাঁজা মাঠটাও রেহাই পায়নি। রেলের আরও একটা লুপ সেখানে বসান হচ্ছে। অমন চার-পাঁচটা বড় বড় নতুন গুদাম-ঘর তৈরী হয়েছে। লোক-লস্কর ইঞ্জিন-মালগাড়ি মোটর-

লরিতে স্টেশন গম্‌গম্‌ করছে রাত-দিন। যুদ্ধের সরঞ্জাম-বোঝাই মালগাড়ি ত যাচ্ছে হরদম। দেশী-বিদেশী সৈন্যদের যাওয়া-আসারও কামাই নেই।

ছেলেগুলো এইখানেই ঘুরে বেড়ায়। স্টেশনেই তাদের ঘর-বাড়ি। আত্মীয়-স্বজন হয়ত তাদেরও ছিল একদিন, কিন্তু সে-সব তাদের মনে নেই। কোথাও কোন সম্বন্ধের ধার তারা আর ধারে না। মেদিনীপুরের ঝড়ে ও বন্যায় তাদের অধিকাংশ এইখানে ছিটকে এসে পড়েছে। কেউ বা এসেছে আপনা থেকে, চিরদিন অনাবশ্যক মানুষের জঞ্জাল যেমন করে এসে এখানে সেখানে জোটে, তেমনি করে।

তারা লোক বুঝে ভিক্ষে চায়, কিন্তু ভিখিরী তারা নয়। সুবিধে পেলে তারা চুরি করে, কিন্তু চোরও তাদের বলা যায় না। লোহা-লক্কড় ইঞ্জিন-মালগাড়ির জগতের তারা এক নতুন জগতের বেদে। সময়ের অসীম স্রোতে প্রতি মুহূর্তের ঢেউএর উপরে তারা কোন রকমে ভেসে থাকে, সামনে বা পিছনের কোন হিসেব রাখে না।

দু-চারটে এখন তখন তলিয়েও যাচ্ছে। কাল যেমন সেই পা-খোঁড়া বিনি বলে মেয়েটা কাটা পড়ল, লাইন পার হতে গিয়ে মালগাড়িতে। মেয়েগুলোর অমনি মরণ-দশা। নইলে সবাই ত তারা ছিল সেখানে। সকালে হঠাৎ কোথা থেকে খবর এসেছিল লাইনের মাঝখানে একটা মালগাড়ির বল্টু রাতারাতি খুলে একটা কব্জা খানিকটা কে ফাঁক করেছে। সেখানে তারের খোঁচা দিলে চাল গড়িয়ে পড়ছে। পঙ্গপালের মত তারা সবাই গিয়ে জুটে আঁজলা-আঁজলা চাল বার করে নিয়েছে। তার পর চৌকিদারের সাড়া পেয়ে সবাই দিয়েছে ছুট। খরগোশের মত তারা সতর্ক—ইঁদুরের মত চালাক। তাদের ধরবে কে! মাল-

সিদ্ধির আড়কাঠি লালমোহন, সেও তখন থেকেই গোরা পল্টনদের গা ঘেঁষে ঘেঁষে আলাপ করার জন্যে ঘুরঘুর করত। সময় পেলেই তাদের কাছে গিয়ে ভিড়ত। গোরাদের কথায় তৎক্ষণাৎ সায় দিয়ে সে বলত, "রাইট্ সার রাইট্! সি বাইট্স্ লাইক এ স্নেক —একদম কালা কেউটে সাপ।" পল্টনদের বোঝাবার জন্যে সে ডান হাতের কব্জির কামড়ের দাগটা পর্যন্ত দেখিয়ে দিত। গোরাগুলো একবার লালমোহনের কব্জির দিকে একবার শ্যামার দিকে চেয়ে নিজেদের মধ্যে কী বলে হাসাহাসি করত, তার পর শ্যামাকে বলত, "তুম্ সাঁপ হ্যায়?" শ্যামার চোখ দুটো সাপের মতই জ্বলে উঠত—হিংস্র ভাবে লালমোহনের দিকে তাকিয়ে সে বলত, "সাপই ত বটে! সেদিন শুধু হাতটা কামড়ে দিয়েছি, এবার একদিন চোখ দুটো ছুবলে নেব কুত্তাটার!" গোরারা এসব কথার মর্ম বুঝত না কিন্তু মুখে তাদের সঙ্গে হাসলেও লালমোহনের ঠোঁটের দুটো পাশ কেমন একটু কুঁচকে যেত কুৎসিত ভাবে।

এই শ্যামাও একদিন হঠাৎ কোথায় হারিয়ে গেল। রাত্রে ছেলেগুলো যখন যেখানে সুবিধে হয়, দল পাকিয়ে শোয়। শুকনো থাকলে প্ল্যাটফর্মেরই ওপর, বৃষ্টি হলে যেখানে একটু ছাউনি জোটে। শ্যামা কিন্তু রাত্রে দলছাড়া হয়ে কোথায় যে কোন দিন শুত তার ঠিক নেই। কখনও ফাঁকা একটা মালগাড়ির ভিতরে, কখনও জলের ট্যাঙ্কের মাথায়। নিধে কতদিন তাকে ভয় দেখিয়ে বলেছে, "একা শুস্ যেখানে সেখানে, কোন দিন রাত্রে নিয়ে যাবে ধরে!"

একদিন রাত্রে শ্যামা সত্যিই উধাও হয়ে যাবে তখন কি কেউ ভেবেছে। সকালে নটবরের স্টলে তাকে দেখা গেল না, তারপর আর কোন দিনই নয়। শুয়েছিল হয়ত কোন মালগাড়িতে; রাত্রে কোন মুলুকে চালান হয়ে গিয়েছে! কেউ বা বলে, রাত্রে তিন নম্বর সাইডিংএ কার যেন কান্না আর চিৎকার শোনা

গিয়েছে। কেউ বা চুপিচুপি জানায় লালমোহনের হাত আছে ব্যাপারটায়।

হয়ত আছে। এ বিষয়ে লালমোহনের সুনাম কারও অজানা নয়, কিন্তু কে তা নিয়ে মাথা ঘামায়। প্ল্যাটফর্মে অমন উড়ো পাতা কত এসে পড়ে। আবার কোথায় উড়ে যায় দমকা হাওয়ায়। তা ছাড়া লালমোহন বড় সোজা লোক নয়। আড়কাঠি থেকে ফতে-চাঁদের কুলিদের দিনমজুরি দেবার সরকার হয়েছে সে আজকাল। হাজার দু-হাজার কুলির জিয়ন-কাঠি মরণ-কাঠি তার হাতে। ফতেচাঁদ সিঙ্ঘি বড় বিচক্ষণ কন্ট্রাকটার। যত কুলিকামিনই লাগুক তার ভাবতে হয় না। পয়সা দিলে এখন চাল মেলে না কোথাও। সে তাই দিন-মজুরির বদলে চাল মেপে দেয়। মস্ত বড় গুদামে তার রাশি রাশি চাল ডাল মজুত। সে-গুদামের ভার লালমোহনের উপর। সেই মজুরি-মাফিক চাল ডাল বেঁটে দেয় সকলকে।

শ্যামার কথা সবাই ভুলে গিয়েছে। নিধেও গিয়েছে। প্রতি-দিনের স্রোতে তারা ভেসে যায়, মনও তাদের স্রোতের মত, কিছু সেখানে বুঝি দাঁড়ায় না। শুধু নিধের মনে কেমন একটা আক্রোশের আগুন আছে লালমোহনের বিরুদ্ধে। লালমোহনকে জব্দ করবার সুবিধে পেলে সে ছাড়বে না। কিন্তু গায়ের ঝাল মেটাবার সময় কই! দিন-কাল একেবারে বদলে গিয়েছে এই কিছুদিনের মধ্যে। পেটের জ্বালা নিবোতেই সারা দিন-রাত চোখ-দুটো জ্বেলে রেখে সজাগ থাকতে হয়। বড় কঠিন লড়াই। আশপাশের সমস্ত গাঁ ভেঙে মেয়ে-মদ্দ বাচ্চা-বুড়ো এসে স্টেশনে ভিড় করেছে—কোথাও এক দানা চাল নেই। তাদের হাহাকারে স্টেশনে কান পাতা যায় না। ট্রেনগুলো আসে, সারা গায়ে গিজগিজ-করা মাছির মতন মানুষ যেন লেপ্টে নিয়ে। ছাদে মানুষ, জানালায়, দরজায়, হাতলে, সর্বত্র মানুষ ঝুলছে। বিলাসপুরে না কোথায় না কি চাল এখনও

সস্তা। বিনা টিকিটে ঝুলতে ঝুলতে তাই মেয়ে-মদ্দ সবাই চলেছে সে-চাল কিনে আনতে। তাও নিজের পয়সায় নিজের জন্যে নয়। ফন্দিবাজ এক দল ব্যবসাদার ঝোপ বুঝে এই বুদ্ধি খাটিয়েছে! বিলাসপুরে আছে তাদের লোক-জন। সেখানে গিয়ে পৌঁছতে পারলে তারাই নিজেদের পয়সায় এদের চাল কিনে দেয়। সে-চাল আবার বিনা টিকিটে রেলের লোকিকে এড়িয়ে যথাস্থানে এনে পৌঁছে দিলে তার কিছু ভাগ মেলে। কাতারে কাতারে লোক তাই ট্রেন ধরে ঝুলতে ঝুলতে চলছে, ট্রেনের তলায় পর্যন্ত রডের উপর শুয়ে শুয়ে যেতে তাদের আপত্তি নেই। রোজ অমন বিশ-পঁচিশটা পড়ছে, হাত পা ভাঙছে, কাটা পড়ছে। স্টেশনে স্টেশনে কুকুরতাড়া খেয়ে দূরে সরে যাচ্ছে, আবার ট্রেন ছাড়তে না ছাড়তে প্রাণের মায়া ছেড়ে এসে লাফিয়ে উঠছে।

যারা যেতে পারছে না, স্টেশনে তারাই হন্যে হয়ে ফিরছে পেটের জ্বালায়। তাদের সঙ্গেই খাবার নিয়ে বেঁচে থাকার লড়াই।

আগে এমনটা কখনও হয়নি। কোথা থেকে কখন কী জুটবে জানা থাকত না বটে কিন্তু উপোস করতেও হত না।

নিধে অবশ্য আজ-কাল অনেক বেশী সেয়ানা হয়েছে। গোরা পল্টনদের হাল-চাল সব তার এখন জানা। নির্ভয়ে তাদের মধ্যে সে ঘোরেফেরে। কী করে তাদের কাছে কী বাগাতে হয় সে জানে। সুবিধে হলে চুরি চামারিও বাদ দেয় না। কোন সাইডিংএ পল্টনের কোন ট্রেন এসে দুচার দিন দাঁড়ালে তার বিশেষ ভাবনা থাকে না। কিন্তু লালমোহন সেখানেও আজকাল তার শনি হয়ে দাঁড়িয়েছে। দুবার তারই শয়তানিতে চোর বলে ধরা পড়ে মার খাওয়া থেকে নিধে কোন রকমে পালিয়ে বেঁচেছে। তার পর দু-চার দিন আর স্টেশন-মুখো হতে পারেনি। স্টেশনের বাইরে বাজারে ঘুরে বেড়িয়েছে মন-মরা হয়ে। স্টেশন তার জীবন। আর

কোথাও নিশ্বাস নিয়েও যেন তার সুখ হয় না। স্টেশনের অন্ধি সন্ধি সব তার জানা। ইঞ্জিনের হুইসিল আর গাড়ির সান্টিংএর শব্দ না শুনলে তার ঘুমই আসে না। ভোরের আগে অন্ধকার থাকতে থাকতে প্ল্যাটফর্মের ঝাঁকড়া আবছা গাছগুলো যখন অসংখ্য সবে-জেগে-ওঠা চড়ুইদের কিচি-মিচিতে গানের মেঘের মত স্টেশনের ওপর ভাসে, তখন সেই কলরব না শুনে জাগলে সত্যি করে সকাল হয়েছে বলেই তার মনে হয় না।

নিধে তারপর আবার স্টেশনে ফিরে এসেছে বটে কিন্তু সারাক্ষণ তাকে ভয়ে ভয়ে সাবধানে থাকতে হয়। কখন লালমোহনের হাতে পড়ে যাবে তার ঠিক নেই। লালমোহন এখন ভয় করবার মত লোক বটে। ঘুষে বখশিসে সমস্ত স্টেশন তার হাতের মুঠোয়। ফ্যা-ফ্যা করে কাঙাল ভিখিরী মেয়েদের সঙ্গে দুটো ফষ্টি নষ্টি করবার জন্যে যে ঘুরে বেড়াত, বাজারের মাঝখানে তার মালগুদামের অফিসঘরে এ-তল্লাটের হোমরা চোমরারা এখন গিয়ে মাঝ-রাতের মজলিস জমায়। একবার আঙুল মটকালে দু-চারটে ঘাড় মটকাবার ক্ষমতা সে রাখে। নিধে তার কাছে নেহাত একটা নোংরা ছুঁচোর সামিল। তবু নিধের উপর তার আক্রোশের অন্ত নেই। তার কারণও আছে।

বিনা-টিকিটে চাল কিনতে যাওয়ার হিড়িকে রেল-লাইন দিয়ে মানুষের যেন বন্যা বয়ে চলেছে রাত-দিন। সেই বন্যায় ভেসে-যাওয়া পুরুষ-মেয়ের পাল হরদম এ-স্টেশনে এসেও ভিড়ছে, বিছিয়ে যাচ্ছে প্ল্যাটফর্মের উপর বনের ভাঙা ডাল-পালার মত। ভিন জায়গার লোক, দুদিনের জন্যে এসে স্টেশনে আশ্রয় নেয়। কিছুই তারা জানে না এখানকার ব্যাপার-ট্যাপার। মেয়েরা এক জায়গায় দলা পাকিয়ে শুয়ে আছে, রাত্রে কোথা থেকে হঠাৎ ফিস্‌ফিসে-গলায় খবর আসে, কাছেই কোন মালগুদামের দেওয়াল

ফুটো হয়েছে, একবার গিয়ে পৌঁছতে পারলেই কোঁচড়ভর্তি চাল। সবাই হয়ত বিশ্বাস করে না। কিন্তু পেটের জ্বালায় মাথার ঠিক থাকবার কথা নয়। মরিয়া হয়ে যারা যায়, তাদের সবাই আর ফেরে না। বাছাই করা দু-চারটে অন্ধকারে একেবারে গায়েব হয়ে যায়।

এমন খবর প্রায়ই আসে, বেছে বেছে ঠিক সোমত্ত জোয়ান মেয়ে যে-দঙ্গলে আছে সেইখানে।

নিধের আর তার দলবলের এ-সব ব্যাপার জানা। কোথায় তারা ঘুপটি মেরে থাকে বলা যায় না। মাঝ-রাতে অমন ফিস্‌ফিসানি উঠলে কখনও তাদের গলা শোনা যায়, "কে গো, থাকো মাসি না?"

থাকো মাসি থতমত খেয়ে প্রথমটা চুপ করে যায়, তার পর গাল পেড়ে বলে, "কে রে তুই মুখপোড়া ওলাউঠো!"

জবাব আসে, "তোমার বোনপো গো মাসি, চিনতে পারলে না। না চেন ত তোমার লালমোহনকে গিয়ে শুধিও।"

"লালমোহনকে বলে তোদের মুখে নুড়ো জ্বালবার বন্দোবস্ত করছি গিয়ে।"

"তাই কর মাসি, আর ওই সঙ্গে লালমোহনকে গিয়ে বল মাল-গুদামে আর দুটো দরোয়ান রাখতে! হামেশা এত লুট হলে আর সেখানে থাকবে কী? এই ত পরশু এই খবর-ই এনেছিলে না?"

চারিদিকে মেয়েদের মধ্যে যেন মৌচাকে ঢিল পড়ায় গুঞ্জন বাড়তে থাকে। গতিক সুবিধে নয় দেখে থাকো মাসি গজরাতে গজরাতে সরে পড়ে।

কিন্তু নিধের দল ত আর সারা রাত গোটা স্টেশনটা পাহারা দিয়ে বেড়াতে পারে না। অত গরজও তাদের নেই, নেহাত চোখ-কানের বাইরে না হলে একটু রগড় না করে পারে না এই যা। কিন্তু

এসব শয়তানি লালমোহনের অজানা নয়। হাতে পেলে সে এখন তাকে জ্যান্ত পুঁতে ফেলতে পারে। তার রাগ যে কতখানি, ছকার বেলাই টের পাওয়া গিয়েছে। ছকা ওরই মধ্যে ছিল একটু বোকা-সোকা। দিন দুপুরে বাজারের মধ্যে সেদিন থাকো মাসিকে দেখে টিট্‌কিরি দিয়ে বলেছিল, "কী গো থাকো মাসি। দিনে আবার বাজার করছ কবে থেকে ? তোমার ত রাতের বাজার—ইষ্টিশনে।" যারা জানে, তারা শুনে হেসেছিল। থাকো মাসি শুরু করেছিল গাল পাড়তে। ঠিক সেই সময়ে কাঁসাই নদীর বালি বোঝাই লরি নিয়ে আসছিল স্বয়ং লালমোহন। গোলমাল দেখে লরি থামাল। ধরা পড়ল ছকা। মালগুদামের অফিস-ঘরের পিছনে ক'খানা বেত তার পিঠের উপর ভেঙেছে তার ঠিক নেই। তারপর চুরির দায়ে চালান হয়ে গিয়েছে সদরে।

নিধে আর তার সাঙ্গপাঙ্গর উপর লালমোহনের জাতক্রোধ কি সাধে! হাল ফেরার সঙ্গে ভোল বদলে ফেলে সবাইকে সব কিছু পুরনো কথা সে ভুলিয়ে দিয়েছে। বাজারে স্টেশনে লালমোহন এখন লালবাবু। শুধু এই হতভাগা স্টেশনের জঞ্জালগুলো কিছু ভোলে না। এখনও তারা দূর থেকে টিট্‌কিরি দেয়, তার নামে ছড়া কাটে।

এরই মধ্যে একদিন শ্যামার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। হ্যাঁ, সেই শ্যামা আবার ফিরে এসেছে স্টেশনে। কিন্তু সে কাল-কেউটে গেল কোথায়! চিরকাল তার হাড়-সার চেহারা। কিন্তু সে-হাড় ছিল যেন ধারালো ইস্পাতের ; এখন যেন পোড়া পাকাটি, টুস্‌কি দিলে ভেঙে যাবে। আগেকার যারা এখনও টিকে আছে, তারা নানান কথা শুধোয়, "কোথায় ছিলি এতদিন ? গেছিলি কেন ? কেন এমন হাল ?" শ্যামা জবাব দেয় না। কে একজন বলে, "লালমোহন নাকি তোকে ধরে নিয়ে গেছল ?" শ্যামার চোখ দুটো দেখে এবার মনে

হয় যে, কাল সাপ এখনও একেবারে মরে যায়নি, সবে খোলস ছেড়ে এসে শুধু নেতিয়ে পড়েছে। কিন্তু নেতিয়ে একেবারে যেন ভেঙে পড়েছে। মড়ার মত ফ্যাকাশে চেহারা, নড়ে বসতে যেন জোর নেই, থেকে থেকে কী বিশ্রী ভাবে যে বুক চেপে ধরে কাসে। কে যেন বলে, শ্যামার বাচ্চা হবে। লুকিয়ে তাই নিয়ে সবাই হাসাহাসিও করে। নিধে তার মধ্যে থাকে না। শ্যামার বাচ্চা হবে ভাবতেই তার কেমন বিশ্রী লাগে। নিজেদের বয়সের হিসেব তাদের নেই। শরীরের বাড়ের মত বয়সও তাদের যেন কোথায় এসে থেমে গিয়েছে। কিন্তু শ্যামা যে তার চেয়ে বেশী বড় নয় সে জানে। শ্যামাকে একদিন সে হিংসে করেছে, তার সঙ্গে রেষারেষি করেছে, তাকে নিজেদের একজন ভেবে।

বাচ্চা বইবার শাস্তি ভোগ করবার মত, শ্যামা যে হঠাৎ একটা আলাদা জাতের হয়ে যেতে পারে এ তার ধারণারই যেন বাইরে। হাওয়ায়-ওড়া তার হাল্কা মন কোথাকার একটা কালো মেঘের চাপে ভারী হয়ে ওঠে তাই। সে মেঘের ভিতর থেকে একটা চাপা বিদ্রোহও থেকে থেকে গুমরে ওঠে—ঠিক কার বিরুদ্ধে সে বোঝে না। বুঝতে গেলে শুধু লালমোহনের ঠোঁটবাঁকান মুখটাই চোখের ওপর ভাসতে থাকে।

দুনম্বর সাইডিংএর কারখানা-ঘরের পিছনে রাতের বেলা শ্যামা কোথায় এসে শোয় নিধে জানে। স্টেশনে আজকাল আলো নেই বললেই হয়। অন্ধকারে কালো করোগেটের দেয়ালের গায়ে শ্যামা যেন একেবারে মিশে থাকে। নিধে এসে তার পাশে বসে পড়ে; তার পর নেহাত যেন তাচ্ছিল্যভরে জিজ্ঞেস করে, "কোথায় ছিলি দিনভর? জোটেনি বোধ হয় কিছু?"

শ্যামা উত্তর দেয় না, তার কাসির ধমক উঠেছে বলেই বোধ হয়। আজকাল সে সত্যিই বেশী দূর ঘুরে ফিরে ভিক্ষে করতেও পারে না।

নিধে একটা কাগজের মোড়া খুলে কী দু-একটা মুখে ফেলে চিবোয়, তারপর কাগজটা শ্যামার দিকে এগিয়ে দিয়ে, অত্যন্ত আমিরী চালে বলে, "ভাল লাগে না আর ছাইপাঁশ চিবোতে, নে, খাবি ত খা!"

শ্যামা তবু হাত না বাড়িয়ে চুপ করে বসে বসে কাসির ধমক সামলে হাঁপায়। নিধে খেঁকিয়ে ওঠে, "বড় যে নবাবজাদি হয়েছিস দেখছি। দিচ্ছি ত নেওয়াই হচ্ছে না। না নিস ত মর উপোষ করে। আমার কী!"

অন্ধকারেও শ্যামার চোখ এবার যেন জ্বলে ওঠে, গলাটাও সেই-সঙ্গে—"মরব না, মরব না—দুষমনের চিতের আগুন না দেখে নয়।"

নিধে গুম্ হয়ে বসে থাকে। তার মনের সেই কালো মেঘ থেকেও একটা জ্বালাময় আগুন যেন ঠিকরে বেরোয়।

শ্যামা এবার কাগজটা তুলে নিয়ে তা থেকে দু-একটা টুকরো চিবোয়। কিবা তাতে আছে—দুটো কুটনোর খোলা, রুটির শক্ত টুকরো, মাংসের হাড়, ডিমের খোলা। বুঝি কোন চলতি ট্রেনের হেঁসেলের জঞ্জাল বাবুর্চিরা যেতে যেতে ফেলে দিয়েছে কাগজে মুড়ে। অমন পঞ্চাশটা মানুষ আর কুকুরের কাড়াকাড়ির ভিতর থেকে তাই ছোঁ মেরে নিয়ে আসতে হয়েছে নিধেকে। ছাইপাঁশ চিবোতে তার ভাল লাগে না বলেই বোধ হয় এত রাত পর্যন্ত কাগজের মোড়াটা সে সাবধানে আগলে নিয়ে ফিরেছে।

ট্রেনের হেঁসেলের জঞ্জালও সব দিন জোটে না। দু দিন ধরে ইঁদুরের মত সেয়ানা নিধেকেও হায়রান হয়ে ঘুরে বেড়াতে হয়েছে খিদের জ্বালায়। স্টেশন ছেড়ে বাজার পর্যন্ত সে হানা দিয়েছে। খাবারের দোকানের ফেলে-দেওয়া পাতাগুলো কুড়িয়ে কুড়িয়ে চেটেছে, দু-চার টুকরো পচা তরি-তরকারি, মাছ কেউ কোথাও ফেলেছে কিনা খুঁজে ফিরেছে। কিছুই তবু জোটেনি।

স্টেশনে এরই মধ্যে লালমোহনের হাতে ধরা সেদিন পড়ে গিয়েছিল আর কি! লালমোহন কী কাজে এসেছিল স্টেশনে। ওভারব্রীজ দিয়ে নামবার পথে একেবারে মুখোমুখি বললেই হয়। কোন রকমে লাফ দিয়ে পালিয়ে নিধে প্ল্যাটফর্মের নীচে গিয়ে ঘুপটি মেরে লুকিয়েছে। লালমোহন তাকে দেখতে পায়নি। কিন্তু শ্যামাকে সে দেখেছে। শ্যামার তাড়াতাড়ি হাঁটবার ক্ষমতা নেই, তবু সে লালমোহনের কাছ থেকে দূরে সরে গিয়ে ওভারব্রীজের তলায় লোহার থামগুলোর সঙ্গে নিজেকে যেন মিশিয়ে দিতে চেয়েছে। কিন্তু লালমোহন নিজে থেকেই গিয়েছে এগিয়ে, ঠোঁট বেঁকিয়ে বলেছে, "আরে কে, শ্যামা না? বাঃ বাঃ, চেহারার যে খুব খোলতাই হয়েছে দেখছি! ভাগ্যিস রাতের বেলা দেখিনি, নইলে ভির্মি যেতাম।"

নতুন একটা ভিখিরী মেয়ে বলেছে, "কী করবে বাবু, খেতে না পেয়ে এমন দশা।"

"খেতে না পেয়ে! পেট ত খালি বলে মনে হচ্ছে না।" বলে নিজের রসিকতায় গলা ছেড়ে হেসে লালমোহন ভিখিরী মেয়েটাকে ছুটো পয়সা ছুঁড়ে দিয়ে চলে গিয়েছে। নিধের মনে হয়েছে তার মাথার ভিতরকার সেই কালো মেঘটা তার চোখের উপর নেমে যেন সব ঝাপসা করে দিলে কয়েক মুহূর্তের জন্যে।

তার পরের দিনই বিকেলের দিকে সেই মিলিটারি ট্রেনটা এসেছিল। বেশীক্ষণ নয়, ঘণ্টা তিনেক বুঝি দাঁড়িয়েছিল স্টেশনে। আর সকলের সঙ্গে নিধেও গিয়েছিল যা পারে গোরা পল্টনদের কাছে বাগাতে। কিন্তু ট্রেন ছাড়বার অনেক আগেই তার আর পাত্তা পাওয়া যায়নি। সবাই একটু অবাক্ হয়েছে বই কি! পল্টনদের সঙ্গে আলাপ জমাতে নিধেই সবার সেরা; সেই সব চেয়ে তুখোড়, ইংরেজী ফড় ফড় করে বলতে। ট্রেন ছাড়বার আগে

সরে পড়বার বান্দা সে ত নয়। লালমোহন সেদিক পানে এলেও না হয় ব্যাপারটা বোঝা যেত। লালমোহন গোরাপল্টনের গাড়ি এলে এখনও মাঝে মাঝে এসে হাজির হয়। সাহেব-সুবোর গা ঘেঁষে তোয়াজ করবার শখ এখনও তার আছে। কিন্তু লালমোহন সেদিন এদিক মাড়ায়নি।

তবু নিধে এ-তল্লাটে আর ছিল না। ট্রেন ছাড়বার পর নিঃশব্দে সে পয়েন্টসম্যানের কেবিনের পাশ দিয়ে বেরিয়ে এসেছে, তার পর আবার অন্ধকারে মিশে গিয়েছে।

অনেক রাত্রে দু-নম্বর সাইডিংএর কারখানা-ঘরের পাশে শ্যামা তার দেখা পেল। ছায়ার মত নিঃশব্দে নিধে এসে পাশে বসবার পর শ্যামাই নিজে থেকে ব্যাকুল ভাবে জিজ্ঞাসা করলে, "এনেছিস কিছু?"

"এনেছি।" নিধের গলার স্বরটা যেন কেমন।

শ্যামা আগ্রহভরে বললে, "কই দেখি!" নিজে থেকে এমন করে শ্যামা কখনও খেতে চায় না। দু-দিন ডাহা উপোসের পর পাথরেও চিড় ধরে।

নিধের তাই বুঝি বলতে গলাটা ধরে গেল, "খাবার পাইনি কিছু।"

শ্যামা একেবারে গুম্ হয়ে গেল এবার। নিধে খানিক চুপ করে থেকে প্রায় যেন চুপি চুপি বললে, "আজ রাত্রে যাবি থাকো মাসির সঙ্গে লালমোহনের মাল-গুদোমে?"

"আমি যাব!" শ্যামার চোখ দুটো জ্বলে উঠল অন্ধকারে, নিধের মনে হল এখুনি যেন সে বাঘিনীর মত হিংস্র ভাবে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। ধীরে ধীরে সে আবার তাই বললে, "আজই যাবার দিন। এই নে।"

কী একটা জিনিস অন্ধকারে শ্যামার দিকে সে বাড়িয়ে দিলে।

তাতে হাত দিয়েই শ্যামা চমকে উঠল—ঠাণ্ডা শক্ত একটা কী। অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলে, "কি এটা ?"

নিধে বুঝিয়ে দিয়ে বললে, "আঁচলে বেঁধে নে !"

অনেক রাত পর্যন্ত অন্ধকারে স্টেশনের এধারে-ওধারে ঘুরে বেড়িয়ে তার পর নিধে লালমোহনের গুদামের দিকে পা বাড়াল। এতক্ষণে সময় হয়েছে নিশ্চয়। কী যে এর মধ্যে হয়, তা সে ভাল করেই জানে। থাকো মাসি আটঘাট বুঝে এসে চুপি চুপি কথাটা যথাস্থানে রটায়। খিদের জ্বালায় উন্মত্ত ছোটখাট একটি দল লোভ সামলাতে না পেরে তার পিছু নেয়। আসল জায়গার হদিস দিয়ে থাকো মাসি তার পর সরে পড়ে। কারও তখন আর দিগ্বিদিক্ জ্ঞান নেই। থাকো মাসির কথা একেবারে মিথ্যে নয়। গুদামের পিছন দিকে সত্যি একটা ছোট দরজা খোলা। সেখান দিয়ে চালও কারা বার করে আনছে দেখা যায়। তারা গিয়ে সেখানে জড় হয়। সাহস করে ভিতরে যায় এক এক করে। চাল একটু-আধটু সরাতে শুরু করেছে এমন সময় কোথা থেকে হৈ চৈ করে ছুটে আসে পাহারাদারেরা। একটু আধটু মারধর খেয়ে যারা ছাড়া পায়, তারা ভাবে খুব বাঁচা বাঁচলাম। কিন্তু ধরে যাদের রাখবার তারা ঠিক ধরা পড়ে। চোরের মার খেয়ে সবাই নিঃশব্দে হজম করে। চোরের নালিশ মুখ ফুটে কেউ জানাতে পারে না।

৩নং সাইডিংএর পর ঢালু রেলের লাইনের পাড়টা দিয়ে নেমে গেলে শাল-বন পড়ে সামনে। সেই শালবনের ভিতর দিয়ে খানিকটা গেলেই ফতেচাঁদ সিঙ্ঘির গুদোম। ফতেচাঁদ আজকাল এ-অঞ্চলে থাকে না। আর কোন বড় কাজ নিয়ে চলে গিয়েছে কোথায়। লালমোহনই এখানে সর্বেসর্বা।

শালবনের ভিতর খানিকটা এগিয়ে গিয়ে নিধে চুপ করে

দাঁড়ায়। নিস্তব্ধ থমথমে রাত, আকাশে চাঁদ নেই। দূরে কোথায় একটা সান্টিং করা ইঞ্জিন যেন হাঁপাচ্ছে। কোথায় ক'টা কুকুর দু-চার বার ডেকে থেমে গেল। শালবনের মাথায় তারাগুলো যেন তারই মত কী একটা শোনবার অপেক্ষায় অধীর হয়ে কাঁপছে।

কী সে শুনতে চায়? কিছু নয়, শুধু হঠাৎ একটা শব্দ, হয়ত তারই সঙ্গে একটা চিৎকার। কিন্তু রাতের স্তব্ধতা অমন করে অকস্মাৎ ভাঙে না। একটা হাল্কা হাওয়ায় কটা পাতা খসখস করে উড়ে যায়। রাত-চরা একটা পাখি ডেকে ওঠে।

অনেকক্ষণ নিধে তবু সেখানে দাঁড়িয়ে থাকে, মশারা তার সন্ধান পেয়ে ঘিরে ধরে গুনগুন করে। এদিক্ ওদিক্ সে পায়চারি করে খানিক, কিন্তু রাত তবু তেমনি স্তব্ধ। শুধু স্টেশনে গাড়ির সঙ্গে গাড়ি জোড়ার শব্দ আসে মাঝে মাঝে—একটানা একটা মালগাড়ির চলে যাওয়ার ঘর্ঘর শোনা যায় অনেকক্ষণ। একটা ইঞ্জিন হুইস্‌ল দিয়ে ওঠে। আর কিছু নয়।

ঘুমে যখন চোখ একেবারে জড়িয়ে আসে তখন অত্যন্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও নিধে ভোরের দিকে আবার স্টেশনে ফিরে যায়।

সকালবেলা ঘুম যখন ভাঙে তখন বেশ বেলা। ভোরের অন্ধকারে পাখির কলরব-ভরা গানে মেঘের মত আবছা গাছগুলো আজ সে দেখতে পায়নি। উঠে শুনল, বাজারে কী একটা কাণ্ড ঘটেছে। অনেকে ছুটছে সেদিকে। তাকেও যেতে হল।

রীতিমত ভিড় জমে গিয়েছে এক জায়গায়। একটা মেয়ে ধুলোর উপরে পড়ে আছে লুটিয়ে,—অজ্ঞান হয়েছে না মারা গিয়েছে বলা যায় না। হাত-পাগুলো যেন যন্ত্রণায় বেঁকে গিয়েছে। নানান জনে নানান কথা বলে। বলে, খুনখারাপি

নয়, মরেছে মোক্ষম রোগে, নাম যার কিনা পেটের জ্বালা। কেউ জিজ্ঞেস করে, কে হে মেয়েটা ?

মেয়েটা শ্যামা নয়। ভিড় থেকে বেরিয়ে স্টেশনের দিকে খানিকটা এগুতেই শ্যামার সঙ্গে দেখা হয়। রাস্তার ধারে বসে পড়ে বুক চেপে ধরে কাসছে। নিধে তার কাছে ছুটে যায়। যা বলতে চায় তা কিন্তু বলতে পারে না। শ্যামা কাসতে কাসতে করুণভাবে তার মুখের দিকে তাকায়। তার আঁচলের দুধারে দুটো পুঁটুলি বাঁধা। একদিকে খানিকটা চাল আর একদিকে নিধের দেওয়া সেই পিস্তল !

তেলেনাপোতা আবিষ্কার

শনি ও মঙ্গলের, মঙ্গলই হবে বোধ হয়, যোগাযোগ হলে তেলেনাপোতা আপনারাও একদিন আবিষ্কার করতে পারেন। অর্থাৎ কাজে কর্মে মানুষের ভিড়ে হাঁফিয়ে ওঠার পর যদি হঠাৎ দু-দিনের জন্যে ছুটি পাওয়া যায়, আর যদি কেউ এসে ফুসলানি দেয় যে, কোন এক আশ্চর্য সরোবরে পৃথিবীর সবচেয়ে সরলতম মাছেরা এখনও তাদের জল-জীবনের প্রথম বঁড়শিতে হৃদয়বিদ্ধ করবার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে, আর জীবনে কখনও কয়েকটা পুঁটি ছাড়া অন্য কিছু জল থেকে টেনে তোলার সৌভাগ্য যদি আপনার না হয়ে থাকে, তাহলে হঠাৎ একদিন তেলেনাপোতা আপনিও আবিষ্কার করতে পারেন।

তেলেনাপোতা আবিষ্কার করতে হলে একদিন বিকেলবেলার পড়ন্ত রোদে জিনিসে মানুষে ঠাসাঠাসি একটা বাসে গিয়ে আপনাকে উঠতে হবে, তারপর রাস্তার ঝাঁকানির সঙ্গে মানুষের গুঁতো খেতে খেতে ভাদ্রের গরমে ঘামে, ধুলোয় চট্‌চটে শরীর নিয়ে ঘণ্টা দু'য়েক বাদে রাস্তার মাঝখানে নেমে পড়তে হবে আচমকা। সামনে দেখবেন নিচু একটা জলার মত জায়গার উপর দিয়ে রাস্তার লম্বা সাঁকো চলে গিয়েছে। তারই উপর দিয়ে বিচিত্র ঘর্ঘর শব্দে বাসটি চলে গিয়ে ওধারে পথের বাঁকে অদৃশ্য হবার পর দেখবেন সূর্য এখনও না ডুবলেও চারিদিক ঘনজঙ্গলে অন্ধকার হয়ে এসেছে। কোন দিকে চেয়ে জনমানব দেখতে পাবেন না। মনে হবে পাখিরাও যেন সভয়ে সে-জায়গা পরিত্যাগ করে চলে

গিয়েছে। একটা স্যাঁতসেতে ভিজে ভাপসা আবহাওয়া টের পাবেন। মনে হবে নীচের জলা থেকে একটা ক্রূর কুণ্ডলিত জলীয় অভিশাপ ধীরে ধীরে অদৃশ্য ফণা তুলে উঠে আসছে।

বড় রাস্তা থেকে নেমে সেই ভিজে জলার কাছেই গিয়ে দাঁড়াতে হবে আপনাকে। সামনে ঘন জঙ্গলের ভিতর দিয়ে মনে হবে একটা কাদাজলের নালা কে যেন কেটে রেখেছে। সে নালার মত রেখাও কিছু দূরে গিয়ে দু ধারে বাঁশঝাড় আর বড় বড় ঝাঁকড়া গাছের মধ্যে হারিয়ে গিয়েছে।

তেলেনাপোতা আবিষ্কারের জন্যে আরও দুজন বন্ধু ও সঙ্গী আপনার সঙ্গে থাকা উচিত। তারা হয়ত আপনার মত ঠিক মৎস্যলুব্ধ নয়, তবু এ-অভিযানে তারা এসেছে, কে জানে আর কোন অভিসন্ধিতে।

তিনজনে মিলে তারপর সামনের নালার দিকে উৎসুকভাবে চেয়ে থাকবেন। মাঝে মাঝে পা ঠুকে মশাদের ঘনিষ্ঠতায় বাধা দেবার চেষ্টা করবেন এবং সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে এ ওর মুখের দিকে চাইবেন।

খানিক বাদে পরস্পরের মুখও আর ঘনায়মান অন্ধকারে ভাল করে দেখা যাবে না। মশাদের ঐকতান আরও তীক্ষ্ণ হয়ে উঠবে। আবার বড় রাস্তায় উঠে ফিরতি কোন বাসের চেষ্টা করবেন কি না যখন ভাবছেন, তখন হঠাৎ সেই কাদাজলের নালা যেখানে জঙ্গলের মধ্যে হারিয়ে গিয়েছে, সেখান থেকে অপরূপ একটি শ্রুতিবিস্ময়কর আওয়াজ পাবেন। মনে হবে বোবা জঙ্গল থেকে কে যেন অমানুষিক এক কান্না নিংড়ে নিংড়ে বার করছে।

সে-শব্দে আপনারা কিন্তু প্রতীক্ষায় চঞ্চল হয়ে উঠবেন। প্রতীক্ষাও আপনাদের ব্যর্থ হবে না। আবছা অন্ধকারে প্রথমে

একটি ক্ষীণ আলো দুলতে দেখা যাবে ও তারপর একটি গরুর গাড়ি জঙ্গলের ভিতর থেকে নালা দিয়ে ধীর মন্থর দোদুল্যমান গতিতে বেরিয়ে আসবে।

যেমন গাড়িটি তেমনি গরুগুলি। মনে হবে পাতালের কোন বামনের দেশ থেকে গরুর গাড়ির এই ক্ষুদ্র সংক্ষিপ্ত সংস্করণটি বেরিয়ে এসেছে।

বৃথা বাক্য ব্যয় না করে সেই গরুর গাড়ির ছইএর ভিতর তিনজনে কোন রকমে প্রবেশ করবেন ও তিন জোড়া হাত ও পা এবং তিনটি মাথা নিয়ে স্বল্পতম স্থানে সর্বাধিক বস্তু কী ভাবে সংস্থাপিত করা যায় সে-সমস্যার মীমাংসা করবেন।

গরুর গাড়িটি তারপর যে-পথে এসেছিল, সেই পথে অথবা নালায় ফিরে চলতে শুরু করবে। বিস্মিত হয়ে দেখবেন, ঘন অন্ধকার অরণ্য যেন সঙ্কীর্ণ একটু সুড়ঙ্গের মত পথ সামনে একটু একটু করে উন্মোচন করে দিচ্ছে। প্রতি মুহূর্তে মনে হবে কালো অন্ধকারের দেয়াল বুঝি অভেদ্য, কিন্তু তবু গরুর গাড়িটি অবিচলিতভাবে ধীর মন্থর গতিতে এগিয়ে যাবে পায়ে পায়ে পথ যেন ছড়িয়ে ছড়িয়ে।

কিছুক্ষণ হাত, পা ও মাথার যথোচিত সংস্থান বিপর্যস্ত হবার সম্ভাবনায় বেশ একটু অস্বস্তি বোধ করবেন। বন্ধুদের সঙ্গে ক্ষণে ক্ষণে অনিচ্ছাকৃত সংঘর্ষ বাধবে, তারপর ধীরে ধীরে বুঝতে পারবেন চারিধারের গাঢ় অন্ধকারে চেতনার শেষ অন্তরীপটিও নিমজ্জিত হয়ে গিয়েছে। মনে হবে পরিচিত পৃথিবীকে দূরে কোথাও ফেলে এসেছেন। অনুভূতিহীন কুয়াশাময় এক জগৎ শুধু আপনার চারিধারে। সময় সেখানে স্তব্ধ, স্রোতহীন।

সময় স্তব্ধ, সুতরাং এ-আচ্ছন্নতা কতক্ষণ ধরে যে থাকবে বুঝতে পারবেন না। হঠাৎ এক সময় উৎকট এক বাদ্য-ঝঞ্ঝনায়

জেগে উঠে দেখবেন, ছইএর ভিতর দিয়ে আকাশের তারা দেখা যাচ্ছে এবং গাড়ির গাড়োয়ান থেকে-থেকে সোৎসাহে একটি ক্যানেস্তারা বাজাচ্ছে।

কৌতূহলী হয়ে কারণ জিজ্ঞাসা করলে গাড়োয়ান নিতান্ত নির্বিকারভাবে আপনাকে জানাবে, এজ্ঞে, ওই শালার বাঘ খেদাতে।

ব্যাপারটা ভাল করে হৃদয়ঙ্গম করার পর, মাত্র ক্যানাস্তারা-নিনাদে ব্যাঘ্র-বিতাড়ন সম্ভব কিনা, কম্পিত কণ্ঠে এ-প্রশ্ন আপনি উত্থাপন করবার আগেই গাড়োয়ান আপনাকে আশ্বস্ত করবার জন্যে জানাবে যে, বাঘ মানে চিতাবাঘ মাত্র, এবং নিতান্ত ক্ষুধার্ত না হলে এই ক্যানাস্তারা-নিনাদই তাকে তফাত রাখবার পক্ষে যথেষ্ট।

মহানগরী থেকে মাত্র ত্রিশ মাইল দূরে ব্যাঘ্র-সঙ্কুল এরকম স্থানের অস্তিত্ব কী করে সম্ভব, আপনি যতক্ষণ চিন্তা করবেন ততক্ষণে গরুর গাড়ি বিশাল একটি মাঠ পার হয়ে যাবে। আকাশে তখন কৃষ্ণপক্ষের বিলম্বিত ক্ষয়িত চাঁদ বোধ হয় উঠে এসেছে। তারই স্তিমিত আলোয় আবছা বিশাল মৌন সব প্রহরী গাড়ির দু পাশ দিয়ে ধীরে ধীরে সরে যাবে। প্রাচীন অট্টালিকার সে-সব ধ্বংসাবশেষ,—কোথাও একটা থাম, কোথাও একটা দেউড়ির খিলান, কোথাও কোন মন্দিরের ভগ্নাংশ, মহাকালের কাছে সাক্ষ্য দেবার ব্যর্থ আশায় দাঁড়িয়ে আছে।

ওই অবস্থায় যতখানি সম্ভব মাথা তুলে বসে কেমন একটা শিহরন সারা শরীরে অনুভব করবেন। জীবন্ত পৃথিবী ছাড়িয়ে অতীতের কোন কুজ্ঝটিকাচ্ছন্ন স্মৃতিলোকে এসে পড়েছেন বলে ধারণা হবে।

রাত তখন কত আপনি জানেন না, কিন্তু মনে হবে এখানে

রাত যেন কখনও ফুরোয় না। নিবিড় অনাদি অনন্ত স্তব্ধতায় সব কিছু নিমগ্ন হয়ে আছে; জাদুঘরের নানা প্রাণী-দেহ আরকের মধ্যে যেমন থাকে।

দু-তিনবার মোড় ঘুরে গরুর গাড়ি এবার এক জায়গায় এসে থামবে। হাত-পাগুলো নানাস্থান থেকে কোন রকমে কুড়িয়ে সংগ্রহ করে কাঠের পুতুলের মত আড়ষ্টভাবে আপনারা একে একে নামবেন। একটা কটু গন্ধ অনেকক্ষণ ধরেই আপনাদের অভ্যর্থনা করছে। বুঝতে পারবেন সেটা পুকুরের পানা-পচা গন্ধ। অর্দ্ধস্ফুট চাঁদের আলোয় তেমন একটি নাতিক্ষুদ্র পুকুর সামনেই চোখে পড়বে। তারই পাশে বেশ বিশালায়তন একটি জীর্ণ অট্টালিকা ভাঙা ছাদ, ধসে পড়া দেওয়াল ও চক্ষুহীন কোটরের মত পাল্লাহীন জানালা নিয়ে নবোদিত চাঁদের বিরুদ্ধে দুর্গ-প্রাকারের মত দাঁড়িয়ে আছে।

এই ধ্বংসাবশেষেরই একটি অপেক্ষাকৃত বাসযোগ্য ঘরে আপনাদের থাকার ব্যবস্থা করে নিতে হবে। কোথা থেকে গাড়োয়ান একটি ভাঙা লণ্ঠন নিয়ে এসে ঘরে বসিয়ে দেবে। সেই সঙ্গে এক কলসি জল। ঘরে ঢুকে বুঝতে পারবেন বহুযুগ পরে মনুষ্যজাতির প্রতিনিধি হিসাবে আপনারাই সেখানে প্রথম পদার্পণ করছেন। ঘরের ঝুল, জঞ্জাল ও ধুলো হয়ত কেউ আগে কখন পরিষ্কার করার ব্যর্থ চেষ্টা করে গিয়েছে। ঘরের অধিষ্ঠাত্রী আত্মা যে তাতে ক্ষুব্ধ, একটি অস্পষ্ট ভাপসা গন্ধে তার প্রমাণ পাবেন। সামান্য চলাফেরায় ছাদ ও দেওয়াল থেকে জীর্ণ পলস্তারা সেই রুষ্ট আত্মার অভিশাপের মত থেকে থেকে আপনাদের উপর বর্ষিত হবে। দু-তিনটি চামচিকা ঘরের অধিকার নিয়ে আপনাদের সঙ্গে সমস্ত রাত বিবাদ করবে।

তেলেনাপোতা আবিষ্কারের জন্যে আপনার দুটি বন্ধুর একজন

পানরসিক ও অপরজনের নিদ্রা-বিলাসী কুম্ভকর্ণের দোসর হওয়া দরকার। ঘরে পৌঁছেই, মেঝের উপর কোনরকমে সতরঞ্চির আবরণ পড়তে না পড়তে একজন তার উপর নিজেকে বিস্তৃত করে নাসিকা-ধ্বনি করতে শুরু করবেন, অপরজন পান-পাত্রে নিজেকে নিমজ্জিত করে দেবেন।

রাত বাড়বে। ভাঙা লণ্ঠনের কাঁচের চিমনি ক্রমশ গাঢ়ভাবে কালিমালিপ্ত হয়ে ধীরে ধীরে অন্ধ হয়ে যাবে। কোন রহস্যময় বেতার-সঙ্কেতে খবর পেয়ে সে-অঞ্চলের সমস্ত সমর্থ সাবালক মশা নবাগতদের অভিনন্দন জানাবে ও তাদের সঙ্গে শোণিত-সম্বন্ধ স্থাপন করতে আসবে। আপনি বিচক্ষণ হলে দেওয়ালে ও গায়ে বসবার বিশিষ্ট ভঙ্গি দেখে বুঝবেন, তারা মশাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় কুলীন, ম্যালেরিয়া দেবীর অদ্বিতীয় বাহন অ্যানোফিলিস। আপনার দুই বন্ধু তখন দুই কারণে অচেতন। ধীরে ধীরে তাই শয্যা পরিত্যাগ করে উঠে দাঁড়াবেন, তারপর গুমোট গরম থেকে একটু পরিত্রাণ পাওয়ার জন্যে টর্চটি হাতে নিয়ে ভগ্নপ্রায় সিঁড়ি দিয়ে উপরের ছাদে উঠবার চেষ্টা করবেন।

প্রতি-মুহূর্তে কোথাও ইট বা টালি খসে পড়ে ভূপতিত হওয়ার বিপদ আপনাকে নিরস্ত করবার চেষ্টা করবে, তবু কোন দুর্বার আকর্ষণে সমস্ত অগ্রাহ্য করে আপনি উপরে না উঠে পারবেন না।

ছাদে গিয়ে দেখবেন, অধিকাংশ জায়গাতে আলিসা ভেঙে ধূলিসাৎ হয়েছে, ফাটলে ফাটলে অরণ্যের পঞ্চম বাহিনী ষড়যন্ত্রের শিকড় চালিয়ে ভিতর থেকে এ-অট্টালিকার ধ্বংসের কাজ অনেক-খানি এগিয়ে রেখেছে; তবু কৃষ্ণপক্ষের ক্ষীণ চাঁদের আলোয় সমস্ত কেমন অপরূপ মোহময় মনে হবে। মনে হবে খানিকক্ষণ চেয়ে থাকলে এই মৃত্যু-সুষুপ্তি-মগ্ন মায়াপুরীর কোন গোপন প্রকোষ্ঠে বন্দিনী রাজকুমারী সোনার কাঠি রুপার কাঠি পাশে

নিয়ে যুগান্তের গাঢ় তন্দ্রায় অচেতন, তা যেন আপনি টের পাবেন। সেই মুহূর্তে অদূরে সঙ্কীর্ণ রাস্তার ওপারে একটি ভগ্নস্তূপ বলে যা মনে হয়েছিল তারই একটি জানালায় একটি আলোর ক্ষীণ রেখা আপনার চোখে পড়বে। সেই আলোর রেখা আড়াল করে একটি রহস্যময় ছায়ামূর্তি সেখানে এসে দাঁড়াবে। গভীর নিশীথরাত্রে কে যে এই বাতায়নবর্তিনী, কেন যে তার চোখে ঘুম নেই, আপনি ভাববার চেষ্টা করবেন, কিন্তু কিছুই বুঝতে পারবেন না। খানিক বাদে মনে হবে সবই বুঝি আপনার চোখের ভ্রম। বাতায়ন থেকে সে-ছায়া সরে গিয়েছে, আলোর ক্ষীণ রেখা গিয়েছে মুছে। মনে হবে এই ধ্বংসপুরীর অতল নিদ্রা থেকে একটি স্বপ্নের বুদ্বুদ ক্ষণিকের জন্য জীবনের জগতে ভেসে উঠে আবার মিলিয়ে গিয়েছে।

আপনি আবার সন্তর্পণে নীচে নেমে আসবেন এবং কখন এক সময়ে দুই বন্ধুর পাশে একটু জায়গা করে ঘুমিয়ে পড়বেন জানতে পারবেন না!

যখন জেগে উঠবেন তখন অবাক হয়ে দেখবেন এই রাত্রির দেশেও সকাল হয়, পাখির কলরবে চারিদিক ভরে যায়।

আপনার আসল উদ্দেশ্য আপনি নিশ্চয় বিস্মৃত হবেন না। এক সময়ে ষোড়শোপচার আয়োজন নিয়ে মৎস্য-আরাধনার জন্যে শ্যাওলা-ঢাকা ভাঙা ঘাটের একটি ধারে বসে গুঁড়ি-পানায় সবুজ জলের মধ্যে যথোচিত নৈবেদ্য সমেত বঁড়শি নামিয়ে দেবেন।

বেলা বাড়বে। ওপারের ঝুঁকে পড়া একটা বাঁশের ডগা থেকে একটা মাছরাঙা পাখি ক্ষণে ক্ষণে আপনাকে যেন উপহাস করবার জন্যেই বাতাসে রঙের ঝিলিক বুলিয়ে পুকুরের জলে ঝাঁপিয়ে পড়বে ও সার্থক শিকারের উল্লাসে আবার বাঁশের ডগায় ফিরে গিয়ে দুর্বোধ ভাষায় আপনাকে বিদ্রূপ করবে। আপনাকে সন্ত্রস্ত করে একটা মোটা লম্বা সাপ ভাঙা ঘাটের কোন ফাটল থেকে বেরিয়ে ধীর

অচঞ্চল গতিতে পুকুরটা সাঁতরে পার হয়ে ওধারে গিয়ে উঠবে, ছুটো ফড়িং পাল্লা দিয়ে পাতলা কাঁচের মত পাখা নেড়ে আপনার ফাতনাটার উপর বসবার চেষ্টা করবে ও থেকে-থেকে উদাস ঘুঘুর ডাকে আপনি আনমনা হয়ে যাবেন।

তারপর হঠাৎ জলের শব্দে আপনার চমক ভাঙবে। নিথর জলে ঢেউ উঠেছে, আপনার ছিপের ফাতনা মৃহুমন্দ ভাবে তাতে ছুলছে। ঘাড় ফিরিয়ে দেখবেন একটি মেয়ে পিতলের ঝকঝকে ঘড়ায় পুকুরের পানা ঢেউ দিয়ে সরিয়ে জল ভরছে। মেয়েটির চোখে কৌতূহল আছে কিন্তু গতিবিধিতে সলজ্জ আড়ষ্টতা নেই। সোজাস্মুজি সে আপনার দিকে তাকাবে, আপনার ফাতনা লক্ষ্য করবে, তারপর আবার মুখ ফিরিয়ে ঘড়াটা কোমরে তুলে নেবে।

মেয়েটি কোন্ বয়সের আপনি বুঝতে পারবেন না। তার মুখের শান্ত করুণ গাম্ভীর্য দেখে মনে হবে জীবনের সুদীর্ঘ নির্মম পথ সে পার হয়ে এসেছে, তার ক্ষীণ দীর্ঘ অপুষ্ট শরীর দেখলে মনে হবে কৈশোর অতিক্রম করে যৌবনে উত্তীর্ণ হওয়া তার যেন স্থগিত হয়ে আছে।

কলসি নিয়ে চলে যেতে যেতে ফিরে তাকিয়ে মেয়েটি হঠাৎ বলবে, "বসে আছেন কেন? টান দিন।"

সে-কণ্ঠ এমন শান্ত মধুর ও গম্ভীর যে, এভাবে আপনা থেকে অপরিচিতের সঙ্গে কথা বলা আপনার মোটেই অস্বাভাবিক ঠেকবে না। শুধু আকস্মিক চমকের দরুন বিহ্বল হয়ে ছিপে টান দিতে আপনি ভুলে যাবেন। তারপর ডুবে-যাওয়া ফাতনা আবার ভেসে উঠবার পর ছিপ তুলে দেখবেন বঁড়শিতে টোপ আর নেই। একটু অপ্রস্তুত ভাবে মেয়েটির দিকে আপনাকে একবার তাকাতেই হবে। সেও মুখ ফিরিয়ে শান্ত ধীর পদে ঘাট ছেড়ে চলে যাবে, কিন্তু মনে হবে মুখ ফেরাবার চকিত মুহূর্তে একটু যেন দীপ্ত হাসির আভাস সেই শান্ত করুণ মুখে খেলে গিয়েছে।

পুকুরের ঘাটের নির্জনতা আর ভঙ্গ হবে না তা৲
মাছরাঙাটা আপনাকে লজ্জা দেবার নিষ্ফল চেষ্টা ত্যাগ
আগেই উড়ে গিয়েছে। মাছেরা আপনার শক্তি-সাম
গভীর অবজ্ঞা নিয়েই বোধ হয় আর দ্বিতীয়বার প্রতিযো ায়
নামতে চাইবে না। খানিক আগের ঘটনাটা আপনার কাছে অবাস্তব বলে মনে হবে। এই জনহীন ঘুমের দেশে সত্যি ওরকম মেয়ে কোথাও আছে আপনি বিশ্বাস করতে পারবেন না।

এক সময়ে হতাশ হয়ে আপনাকে সাজসরঞ্জাম নিয়ে উঠে পড়তে হবে। ফিরে গিয়ে হয়ত দেখবেন আপনার মৎস্যশিকার-নৈপুণ্যের বৃত্তান্ত ইতিমধ্যে কেমন করে আপনার বন্ধুদের কর্ণগোচর হয়েছে। তাদের পরিহাসে ক্ষুণ্ণ হয়ে এ-কাহিনী কোথায় তারা শুনল, জিজ্ঞাসা করে হয়ত আপনার পান-রসিক বন্ধুর কাছে শুনবেন, "কে আবার বলবে! এই মাত্র যামিনী নিজের চোখে দেখে এল যে!"

আপনাকে কৌতূহলী হয়ে যামিনীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করতেই হবে। তখন হয়ত জানতে পারবেন যে, পুকুর-ঘাটের সেই অবাস্তব করুণনয়না মেয়েটি আপনার পানরসিক বন্ধুটিরই জ্ঞাতিস্থানীয়া। সেই সঙ্গে আরও শুনবেন যে, দ্বিপ্রাহরিক আহারের ব্যবস্থাটা সেদিনকার মত তাদের ওখানেই হয়েছে।

যে ভগ্নস্তূপে গত রাত্রে ক্ষণিকের জন্যে একটি ছায়ামূর্তি আপনার বিস্ময় উৎপাদন করেছিল, দিনের রূঢ় আলোয় তার শ্রীহীন জীর্ণতা আপনাকে অত্যন্ত পীড়িত করবে। রাত্রির মায়াবরণ সরে গিয়ে তার নগ্ন ধ্বংস-মূর্তি এত কুৎসিত হয়ে উঠতে পারে আপনি ভাবতে পারেননি।

এইটিই যামিনীদের বাড়ি জেনে আপনি অবাক হবেন। এই বাড়িরই একটি ঘরে আপনাদের হয়ত আহারের ব্যবস্থা হয়েছে।

আয়োজন যৎসামান্য, হয়ত যামিনী নিজেই পরিবেশন করছে। মেয়েটির অনাবশ্যক লজ্জা বা আড়ষ্টতা যে নেই, আপনি আগেই লক্ষ্য করেছেন, শুধু কাছ থেকে তার মুখের করুণ গাম্ভীর্য আরও বেশী করে আপনার চোখে পড়বে। এই পরিত্যক্ত বিস্মৃত জনহীন লোকালয়ের সমস্ত মৌন বেদনা যেন তার মুখে ছায়া ফেলেছে। সব কিছু দেখেও তার দৃষ্টি যেন গভীর এক ক্লান্তির অতলতায় নিমগ্ন। একদিন যেন সে এই ধ্বংসস্তূপেই ধীরে ধীরে বিলীন হয়ে যাবে

আপনাদের পরিবেশন করতে করতে দু-চারবার তাকে তবু চঞ্চল ও উদ্বিগ্ন হয়ে উঠতে আপনি দেখবেন। উপর-তলার কোন ঘর থেকে ক্ষীণ একটা কণ্ঠ যেন কাকে ডাকছে। যামিনী ব্যস্ত হয়ে বাইরে চলে যাবে। প্রত্যেকবার ফিরে আসবার সঙ্গে তার মুখে বেদনার ছায়া যেন আরও গভীর হয়ে উঠছে মনে হবে, সেই সঙ্গে কেমন একটা অসহায় অস্থিরতা তার চোখে।

খাওয়া শেষ করে আপনারা তখন একটু বিশ্রাম করতে পারেন। অত্যন্ত দ্বিধাভরে কয়েকবার ইতস্তত করে সে যেন শেষে মরিয়া হয়ে দরজা থেকে ডাকবে, "একটু এখানে শুনে যাও মণিদা।"

মণিদা আপনার সেই পানরসিক বন্ধু। তিনি দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াবার পর যে আলাপটুকু হবে তা এমন নিম্নস্বরে নয় যে, আপনারা শুনতে পাবেন না।

শুনবেন, যামিনী অত্যন্ত কাতর স্বরে বিপন্নভাবে বলছে "মা, ত কিছুতেই শুনছেন না। তোমাদের আসার খবর পাওয়া অবধি কী যে অস্থির হয়ে উঠেছেন কী বলব।"

মণি একটু বিরক্তির স্বরে বলবে, "ওঃ সেই খেয়াল এখনও! নিরঞ্জন এসেছে, ভাবছেন বুঝি?"

"হ্যাঁ, কেবলই বলছেন, 'সে নিশ্চয় এসেছে। শুধু লজ্জায়

আমার সঙ্গে দেখা করতে পারছে না, আমি জানি। তাকে ডেকে দে। কেন তুই আমার কাছে লুকোচ্ছিস!' কী যে আমি করব ভেবে পাচ্ছি না। অন্ধ হয়ে যাবার পর থেকে আজকাল এত অধৈর্য বেড়েছে যে, কোন কথা বুঝলে বোঝেন না, রেগে মাথা খুঁড়ে এমন কাণ্ড করেন যে, তখন ওঁর প্রাণ বাঁচান দায় হয়ে ওঠে!"

"হুঁ, এ ত বড় মুশকিল দেখছি। চোখ থাকলেও না হয় দেখিয়ে দিতাম যে, যারা এসেছে তাদের কেউ নিরঞ্জন নয়।"

উপর থেকে দুর্বল অথচ তীক্ষ্ণ ক্রুদ্ধ কণ্ঠের ডাকটা এবার আপনারাও শুনতে পাবেন। যামিনী এবার কাতর কণ্ঠে অনুনয় করবে, "তুমি একবারটি চল মণিদা, যদি একটু বুঝিয়ে শুঝিয়ে ঠাণ্ডা করতে পার।"

"আচ্ছা তুই যা, আমি আসছি।" মণি এবার ঘরে ঢুকে নিজের মনেই বলবে, "এ এক আচ্ছা জ্বালা হয়েছে যা হক। বুড়ির হাত পা পড়ে গেছে, চোখ নেই, তবু বুড়ি পণ করে বসে আছে কিছুতেই মরবে না।"

ব্যাপারটা কী এবার আপনারা হয়ত জানতে চাইবেন। মণি বিরক্তির স্বরে বলবে, "ব্যাপার আর কী! নিরঞ্জন বলে ওঁর দূর সম্পর্কের এক বোনপোর সঙ্গে ছেলেবেলায় যামিনীর সম্বন্ধ উনি ঠিক করেছিলেন। বছর চারেক আগেও সে-ছোকরা এসে ওঁকে বলে গিয়েছিল বিদেশের চাকরি থেকে ফিরে ওঁর মেয়েকে সে বিয়ে করবে। সেই থেকে বুড়ি এই অজগর-পুরীর ভেতর বসে সেই আশায় দিন গুনছে।"

আপনি নিজে থেকে এবার জিজ্ঞাসা না করে পারবেন না, "নিরঞ্জন কি এখনও বিদেশ থেকে ফেরেনি?"

"আরে সে বিদেশে গিয়েছিল কবে যে ফিরবে! নেহাত বুড়ি নাছোড়বান্দা বলে তাকে এই ধাপ্পা দিয়ে গিয়েছিল। এমন ঘুঁটে-

কুড়ুনির মেয়েকে উদ্ধার করতে তার দায় পড়েছে। সে কবে বিয়ে-থা করে দিব্যি সংসার করছে। কিন্তু সে-কথা ওঁকে বলে কে? বললে বিশ্বাসই করবেন না, আর বিশ্বাস যদি করেন তা হলে এখুনি ত দম ছুটে অক্কা! কে মিছিমিছি পাতকের ভাগী হবে?"

"যামিনী নিরঞ্জনের কথা জানে?"

"তা আর জানে না! কিন্তু মার কাছে বলবার উপায় ত নেই। যাই, কর্মভোগ সেরে আসি!" বলে মণি সিঁড়ির দিকে পা বাড়াবে।

সেই মুহূর্তে নিজের অজ্ঞাতসারেই আপনাকে হয়ত উঠে দাঁড়াতে হবে। হঠাৎ হয়ত বলে ফেলবেন, "চল, আমিও যাব।"

"তুমি যাবে!" মণি ফিরে দাঁড়িয়ে সবিস্ময়ে নিশ্চয় আপনার দিকে তাকাবে।

"হ্যাঁ, কোন আপত্তি আছে গেলে?"

"না, আপত্তি কিসের!" বলে বেশ বিমূঢ়ভাবেই মণি আপনাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে।

সঙ্কীর্ণ অন্ধকার ভাঙা সিঁড়ি দিয়ে যে-ঘরটিতে আপনি পৌঁছবেন, মনে হবে উপরে নয়, মাটির তলার সুড়ঙ্গেই বুঝি তার স্থান। একটি মাত্র জানালা, তাও বন্ধ, বাইরের আলো থেকে এসে প্রথমে আপনার চোখে সবই ঝাপসা ঠেকবে, তারপর টের পাবেন, প্রায় ঘরজোড়া একটি ভাঙা তক্তাপোষে ছিন্ন-কন্থা-জড়িত একটি শীর্ণ কঙ্কালসার মূর্তি শুয়ে আছে। তক্তাপোষের একপাশে যামিনী পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে।

আপনাদের পদশব্দ শুনে সেই কঙ্কালের মধ্যেও যেন চাঞ্চল্য দেখা দেবে, "কে, নিরঞ্জন এলি? অভাগী মাসিকে এতদিনে মনে পড়ল বাবা! তুই আসবি বলে প্রাণটা যে আমার কণ্ঠায় এসে আটকে আছে। কিছুতেই যে নিশ্চিন্তি হয়ে মরতে পারছিলাম না। এবার ত আর অমন করে পালাবি না?"

মণি কী যেন বলতে যাবে, তাকে বাধা দিয়ে আপনি অকস্মাৎ বলবেন, "না মাসিমা, আর পালাব না।"

মুখ না তুলেও মণির বিমূঢ়তা ও আর একটি স্থাণুর মত মেয়ের মুখে স্তম্ভিত বিস্ময় আপনি যেন অনুভব করতে পারবেন। কিন্তু কোনদিকে তাকাবার অবসর আপনার থাকবে না। দৃষ্টিহীন দুটি চোখের কোটরের দিকে আপনি তখন নিস্পন্দ হয়ে রুদ্ধ নিশ্বাসে চেয়ে আছেন। মনে হবে সেই শূন্য কোটরের ভিতর থেকে অন্ধকারের দুটি কালো শিখা বেরিয়ে এসে যেন আপনার সর্বাঙ্গ লেহন করে পরীক্ষা করছে। কটি স্তব্ধ মুহূর্ত ধীরে ধীরে সময়ের সাগরে শিশির-বিন্দুর মত ঝরে পড়ছে, আপনি অনুভব করবেন। তারপর শুনতে পাবেন, "আমি জানতাম তুই না এসে পারবি না বাবা। তাই ত এমন করে এই প্রেতপুরী পাহারা দিয়ে দিন গুনেছি।"

বৃদ্ধা এতগুলি কথা বলে হাঁফাবেন, চকিতে একবার যামিনীর উপর দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে আপনার মনে হবে বাইরের কঠিন মুখোশের অন্তরালে তার মধ্যেও কোথায় যেন কী ধীরে ধীরে গলে যাচ্ছে, ভাগ্য ও জীবনের বিরুদ্ধে, গভীর হতাশার উপাদানে তৈরী এক সুদৃঢ় শপথের ভিত্তি আল্‌গা হয়ে যেতে আর বুঝি দেরি নেই।

বৃদ্ধা আবার বলবেন, "যামিনীকে নিয়ে তুই সুখী হবি বাবা। আমার পেটে হয়েছে বলে বলছি না, এমন মেয়ে হয় না। শোকে-তাপে বুড়ো হয়ে মাথার ঠিক নেই, রাতদিন খিটখিট করে মেয়েটাকে যে কত যন্ত্রণা দিই, তা কি আমি জানি না। তবু মুখে ওর রা নেই। এই শ্মশানের দেশ, দশটা বাড়ি খুঁজলে একটা পুরুষ মেলে না। আমার মত ঘাটের মড়ারা শুধু ভাঙা ইঁট আঁকড়ে এখানে সেখানে ধুঁকছে, এরই মধ্যে একাধারে মেয়ে পুরুষ হয়ে ও কী না করছে!"

একান্ত ইচ্ছা সত্ত্বেও চোখ তুলে একটিবার তাকাতে আপনার সাহস হবে না। আপনার নিজের চোখের জল বুঝি আর গোপন রাখা যাবে না।

বৃদ্ধা ছোট একটি নিশ্বাস ফেলে বলবেন, "যামিনীকে তুই নিবি ত বাবা! তোর শেষ কথা না পেলে আমি মরেও শান্তি পাব না।"

ধরা গলায় আপনি তখন শুধু বলতে পারবেন, "আমি তোমায় কথা দিচ্ছি মাসিমা। আমার কথার নড়চড় হবে না।"

তারপর বিকালে আবার গরুর গাড়ি দরজায় এসে দাঁড়াবে। আপনারা তিনজনে একে একে তাতে উঠবেন। যাবার মুহূর্তে গাড়ির কাছে এসে দাঁড়িয়ে আপনার দিকে সেই করুণ দুটি চোখ তুলে যামিনী শুধু বলবে, "আপনার ছিপটিপ যে পড়ে রইল!"

আপনি হেসে বললেন, "থাক না। এবারে পারিনি বলে, তেলেনাপোতার মাছ কি বার বার ফাঁকি দিতে পারবে!"

যামিনী মুখ ফিরিয়ে নেবে না। ঠোঁট থেকে নয়, মনে হবে, তার চোখের ভিতর থেকে মধুর একটি সকৃতজ্ঞ হাসি শরতের শুভ্র মেঘের মত আপনার হৃদয়ের দিগন্ত স্নিগ্ধ করে ভেসে যাচ্ছে।

গাড়ি চলবে। কবে এক শ না দেড় শ বছর আগে প্রথম ম্যালেরিয়ায় মড়কের এক দুর্বার বন্যা তেলেনাপোতাকে চলমান জীবন্ত জগতের এই বিস্মৃতিবিলীন প্রান্তে ভাসিয়ে এনে ফেলে রেখে গিয়েছিল—আপনার বন্ধুরা হয়ত সেই আলোচনা করবেন। সে-সব কথা ভাল করে আপনার কানে যাবে না। গাড়ির সঙ্কীর্ণতা আর আপনাকে পীড়িত করবে না, তার চাকার একঘেয়ে কাঁদুনি আর আপনার কাছে কর্কশ লাগবে না। আপনি শুধু নিজের হৃৎস্পন্দনে একটি কথাই বার বার ধ্বনিত হচ্ছে, শুনবেন,—"ফিরে আসব, ফিরে আসব।"

মহানগরের জনাকীর্ণ আলোকোজ্জ্বল রাজপথে যখন এসে

পৌঁছবেন তখনও আপনার মনে তেলেনাপোতার স্মৃতি সুদূর অথচ অতি অন্তরঙ্গ একটি তারার মত উজ্জ্বল হয়ে আছে। ছোটখাট বাধা-বিড়ম্বিত কটি দিন কেটে যাবে। মনের আকাশে একটু করে কুয়াশা জমছে কিনা আপনি টের পাবেন না। তারপর যেদিন সমস্ত বাধা অপসারিত করে তেলেনাপোতায় ফিরে যাবার জন্যে আপনি প্রস্তুত হবেন, সেদিন হঠাৎ মাথার যন্ত্রণায় ও কম্প-দেওয়া শীতে, লেপ, তোষক মুড়ি দিয়ে আপনাকে শুতে হবে। থার্মো-মিটারের পারা জানাবে এক শত পাঁচ ডিগ্রী, ডাক্তার এসে বলবে, "ম্যালেরিয়াটি কোথা থেকে বাগালেন?" আপনি শুনতে শুনতে জ্বরের ঘোরে আচ্ছন্ন হয়ে যাবেন।

বহুদিন বাদে অত্যন্ত দুর্বল শরীর নিয়ে বখন বাইরের আলো-হাওয়ায় কম্পিত পদে এসে বসবেন, তখন দেখবেন নিজের অজ্ঞাতসারে দেহ ও মনের অনেক ধোয়া-মোছা ইতিমধ্যে হয়ে গিয়েছে। অস্ত-যাওয়া তারার মত তেলেনাপোতার স্মৃতি আপনার কাছে ঝাপসা একটা স্বপ্ন বলে মনে হবে। মনে হবে তেলেনাপোতা বলে কোথায় কিছু সত্যি নেই। গম্ভীর কঠিন যার মুখ আর দৃষ্টি যার সুদূর ও করুণ, ধ্বংসপুরীর ছায়ার মত সেই মেয়েটি হয়ত আপনার কোন দুর্বল মুহূর্তের অবাস্তব কুয়াশাময় কল্পনা মাত্র।

একবার ক্ষণিকের জন্যে আবিষ্কৃত হয়ে তেলেনাপোতা আবার চিরন্তন রাত্রির অতলতায় নিমগ্ন হয়ে যাবে।

পটভূমিকা

বুধন চৌকিদারের হাঁক আজকাল আর শোনা যায় না। সে এক রকম ছুটি পেয়েছে। গাঁয়ে কদিন ধরে একটা রাত-পাহারার দল তৈরী হয়েছে। সারারাত পাহারা দিয়ে তারা সমস্ত গাঁ টহল দিয়ে বেড়ায়। আর মাঝে মাঝে যা হাঁক ছাড়ে, তাতে চোর ডাকাতের চেয়ে গৃহস্থের রক্তই আগে শুকিয়ে যাবার কথা।

দলটি বেশ ভারী। কদিন আগে হারান বুড়োর গঙ্গাযাত্রার খাট বইবার জন্যে যেখানে চারটে জোয়ান ছেলে বোয়ানবাদি থেকে বীরগঞ্জ পর্যন্ত খুঁজে বার করতে হয়রান হতে হয়েছে, সেখানে ছেলের দল পিল-পিল করছে আজকাল ঘরে ঘরে।

কলকাতায় বোমার ভয়েই বুঝি গাঁয়ের এমন বরাত খুলেছে হঠাৎ। ভিটেতে তিন পুরুষ যাদের সন্ধ্যা পড়েনি এতদিন, তাদেরও পোড়ো বাড়িতে হঠাৎ জনমজুর লেগে গিয়েছে বাড়ি মেরামত করতে। হেঁজি-পেঁজি থেকে হোমরা-চোমরা গাঁয়ে যার এতটুকু আস্তানা আছে, কেউ আর আসতে বাকি নেই।

সামন্তদের ভুতুড়ে ভিটেটাতেও দেখা যায় রাত্রে আলো জ্বলে। সামনের জঙ্গল পরিষ্কার হয়ে দুটো নতুন ঘরের চালাও এরই মধ্যে তোলা হয়ে গিয়েছে।

ছেলের দলের অনেকেরই গাঁয়ের সঙ্গে এই প্রথম সাক্ষাৎ। তবু কাণাঘুষায় তারা ইতিমধ্যে অনেক কথা হয়ত শুনেছে। মজুমদার-বাড়ির রবি একটু বেশী জোরেই সবার আগে হঠাৎ তাদের মার্কামারা পিলে-চমকানো ডাক ছাড়ে—এ—হো, হারা-রা-রা-রা-রা।

সবাইকে সমস্বরে যোগ দিতে হয়। হাঁক শেষ হলে বিভূতি হেসে বলে, "রবিটা ভয় পেয়েছে, বুঝেছিস।"

"ভয়? বাঃ, ভয় পাব আমি!" রবি প্রতিবাদ জানায়। "ভয়টা আমার কিসের শুনি? আমি ত তোদের মত শহুরে সভ্য নই যে, কেঁচো দেখে কেউটে ভাবব! গাঁয়ের ছেলে, গাঁয়ে আবার ভয় কিসের!"

বিভূতি হেসে বলে, "গাঁয়ের ছেলে বলেইত গাঁয়ে বেশী ভয়! শহুরে ছেলে কেঁচো কেউটে কিছুই চেনেনা, আর তোরা যে গাঁয়ের আনাচে-কানাচে আঁদাড়ে-পাঁদাড়ে সব ভূত-পেরেত-জুজু বসিয়ে রেখেছিস! সামন্তদের এই পোড়ো ভিটেটায় ত তোদের কোন শাঁকচুন্নীর বাস, না?"

তর্কটা আরও কিছুদূর হয়ত, চলত কিন্তু অমল হঠাৎ চাপাগলায় বলে "আলো নিয়ে কে বেরুচ্ছে যে বাড়ি থেকে!"

সকলেরই গলা বন্ধ হয়ে যায়। পোড়ো ভিটের ভিতর থেকে আলো হাতে সত্যিই কে বেরিয়ে আসছে।

রবি তাড়াতাড়ি বলে, "চ, ভাই, চ, এগিয়ে যাই।"

"কেন, ভয় কিসের?" বিভূতি শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে।

রবি ভয়ের অপবাদে একটু রেগে উঠেই বলে, "আহা, ভয়ের জন্যে কি যেতে বলছি। কিন্তু রাত দুপুরে গোলমাল করে লাভ কী। বুড়ো শুনেছি, বড় বেয়াড়া লোক।"

"আমরাও বেয়াড়া ছেলে। আর খেয়ে ত ফেলবে না।" বিভূতি যেন গোঁ ধরে দাঁড়িয়ে থাকে।

রবি শুধু নয়, এ-ব্যাপারে রুখে দাঁড়ানটা দেখা যায় অনেকেরই পছন্দ নয়। অমল বলে, "না না দোষ ত আমাদের। রাতদুপুরে ডাকাত-পড়া চীৎকার করে, তা নিয়ে ঝগড়া ঝাঁটি করে লাভ কী। বুড়োর আবার মাথায় নাকি ছিট আছে।"

ভুবন বারুই এতক্ষণ বাবুদের কথায় মাথা গলায়নি। এবার সায় দিয়ে বলে, "আজ্ঞে হাঁ বাবু, দুদিন চাল ছাইতে গিয়েই আমি টের পেয়েছি। যেমন বুড়ো তেমনি মেয়েটা। কী যেন একরকম বাবু। আর সহজ মানুষ হলে কি ওই অজগর পুরীতে কেউ ডেরা বাঁধে? অপদেবতার ভয় না থাক, সাপখোপের ভয়ও কি নেই?"

বিভূতির ভাব দেখে মনে হল, এ-সব কোন কথাতেই তাকে বুঝি টলান যাবে না। কিন্তু ব্যাপারটা আপনা থেকেই আর এগোয় না। পোড়ো ভিটের আলোটা খানিক এগিয়েই এক জায়গায় স্থির হয়ে থাকে। দূর থেকে সে অস্পষ্ট আলোয় বিশেষ কিছু দেখা যায় না। খানিক বাদে আলোটা আবার দেখা যায় ভিতরের দিকে সরে যাচ্ছে।

বিভূতি এবার একটা অবজ্ঞা-মেশান জয়ের হাসি হেসে বলে, "বেয়াড়া লোক শুনে ভয় পাবার ছেলে বিভূতি ঘোষ নয়। এমন ঢের বেয়াড়া আমরা সিধে করেছি।"

সবাই আবার সামনের দিকে এগোয়। বিভূতির বাহাদুরিতে খুশী বোধ হয় মনে মনে কেউ হয় নি। বিভূতি যেন অত্যন্ত অন্যায় ভাবে সকলের উপর টেক্কা দিয়ে ফেলেছে। তার সব বিষয়ে টেক্কা দেওয়ার ধরনটাই কারও ভাল লাগে না।

গাজনতলা পার না হওয়া পর্যন্ত আর কারও হাঁক দেওয়ার কথা মনে থাকে না। হাঁকটাও এবার কেমন যেন ঝাঁঝালো নয়। রাত প্রায় দুটো বাজে। প্রথম দলের পাহারার পালা এবার শেষ। ভদ্রেশ্বরীর মন্দির বাঁয়ে রেখে এবার সবাই চৌধুরী-বাড়ির পথ ধরে। সেখানে চৌধুরীদের নাটমঞ্চে শেষ রাতের পাহারার দল অপেক্ষা করে আছে।

সবাইকার পা একটু জোরে চলে এবার। অন্ধকার ভিথির

রাত-পাহারা তেমন যেন জমে না। শুধু অমল একটু পিছিয়ে পড়ে, বুঝি ইচ্ছে করেই।

অমল স্পষ্টই দলছাড়া। রাত-পাহারার দলে সে নাম লিখিয়েছে কিন্তু আর সবাইকার মত হুজুগে পড়ে বা চৌধুরীদের কথা ঠেলতে না পেরে নয়।

চৌধুরী-বাড়ি থেকে পাহারার দলের জন্য রোজ সন্ধ্যায় যে চা-জলখাবার আসে তার লোভ, আর যার থাক তার অন্তত নেই। রাত-পাহারায় সমস্ত নির্জন গ্রাম টহল দিয়ে বেড়াতেই তার বড় ভাল লাগে।

গাজনতলা পার হয়ে ভদ্রেশ্বরী মন্দিরের কাছে এলেই তার মনটা কেমন যেন করে ওঠে। প্রথম রাত-পাহারার বেলাই তার এমন হয়েছিল, এতদিনেও কিন্তু সে অনুভূতিটা পুরনো হল না। এখনও সমস্ত দেহে কী রকম যেন একটা নেশা লাগতে থাকে—একটা অদ্ভুত আনন্দ।

কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী কি নবমী। বাঁয়ে শীতলবাঁধের তালগাছ-গুলোর ফাঁকে আকাশে নিভু-নিভু আগুনের মত একটা মরা লালচে রঙের ছোপ দেখা যাচ্ছে। খানিক বাদেই মাঝরাতের খয়ে যাওয়া চাঁদ দেখা দেবে। এই মরা লালচে আলোর কেমন একটা থমথমে ভাব আছে, কেমন যেন আতঙ্কের আভাষ। ভদ্রেশ্বরীর মন্দিরের সবটাই অন্ধকারে অস্পষ্ট; শুধু তে-ফলা পেতলের চুড়োটা কি একটা ভয়ঙ্কর ইঙ্গিত নিয়ে যেন আকাশের দিকে উঁচিয়ে আছে।

ভদ্রেশ্বরী আজকাল অত্যন্ত ভদ্র সভ্য দেবী। চৌধুরীরা অনেক-কাল তাঁর সেবা করে আসছে। তারা চার পুরুষ ধরে বৈষ্ণব। ভদ্রেশ্বরীর তাই শশা কুমড়োর বেশী আর আজকাল কিছুতে লোভ নেই। কিন্তু একদিন ছিল যখন এ-মন্দিরের চত্বর রক্তে ভেসে

গিয়েছে। নর-রক্তও নাকি বাদ যায়নি। কিন্তু সেও বুঝি সে দিনের কথা। দেবীমূর্তিকে অন্ধকার গর্ভগৃহে দেখবার সৌভাগ্য একদিন অমলের ইতিমধ্যে হয়েছে। অমল খুব বেশী কিছু জানেনা কিন্তু মূর্তিটি যে চিরদিন এমন রক্তলোভাতুরা ছিলেন না এটুকু বুঝতে তার দেরি লাগেনি। তারা, না মৈত্রেয়ী, না শীলভদ্রা, বৌদ্ধযুগে কী তাঁর নাম ছিল কে জানে। সে নাম কোথায় হারিয়ে গিয়েছে। তারপর কবে কেমন করে পরিচয় ও প্রকৃতি দুই-ই তাঁর নূতন ভক্তের হাতে বদলে গিয়েছে, কেউ জানে না। সে কতকালের কথা অমল ভাবতেও পারেনা। তবু গভীর শীতের রাত্রে এই নির্জন পথ দিয়ে যেতে তার শরীরে কেমন যেন একটা শিহরণ লাগে। সেই সুদূর অতীত তার সমস্ত বর্ণ-সমারোহ নিয়ে যেন এই অন্ধকারের তলাতেই জেগে আছে। একটু ঘষে নিলেই যেন ধুলো-পড়া কাঁচের মত তার তলায় সে-মূর্তি স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

কী ছিল তখন এই গ্রামের রূপ! ভদ্রেশ্বরীর মন্দিরের পাশে ছায়া-করা এই প্রাচীন বটগাছ বুঝি শুধু সেদিনের সাক্ষী। শীতলবাঁধের পাশে ওই বিরাট মাটির ঢিবি হয়ত সেদিন ছিল আচার্য শ্রমণ ভিক্ষুদের কণ্ঠোচ্চারিত মন্ত্রে মুখর নির্জন অরণ্য-বেষ্টিত সংঘারাম। প্রাচীন যুগের কত চিহ্ন কতজন ত সেখানে কুড়িয়ে পেয়েছে। এই নির্জন সংঘারামে হয়ত কোন এক এমনি শীতের গভীর রাত্রি উজ্জ্বল মশালের আলোয় বিক্ষত হয়ে উঠেছে। শোনা গিয়েছে বহু পদাতিক, অশ্ব ও হস্তীর পদধ্বনি ও কোলাহল। বহুদূর থেকে কোন প্রবল-প্রতাপ সদ্ধর্ম-অনুরাগী রাজা এই অরণ্য-বেষ্টিত সংঘারামের মহাস্থবির প্রধান আচার্যের অসামান্য বিভূতির কথা শুনেছেন। গভীর রাত্রে তিনি এসেছেন সদলে আচার্যের কাছে, তাঁর গোপন অভিপ্রায়-সিদ্ধির সহায়তা প্রার্থনা করতে। কে জানে এই সংঘারামেও তখন সদ্ধর্ম ব্যভিচারে

বিকৃত হয়ে উঠেছে কি না। কে জানে, এই প্রাচীন বট কত অমানুষিক অনুষ্ঠানের স্মৃতি তার গোপন মর্ম-কোষে সঞ্চিত করে রেখেছে। কিংবা হয়ত এ সংঘারাম সত্যই তখনও তথাগতের অমৃতবাণী বিস্মৃত হয়নি। সামান্য ঐহিক ইষ্ট সাধনের উদ্দেশ্যে এসে, সৌম্য, শান্ত, করুণার্দ্রনয়ন মহাস্থবিরের কাছ থেকে রাজা হয়ত শাশ্বত জীবনের শ্রেষ্ঠ মন্ত্র নিয়ে ফিরে গিয়েছেন। শান্ত নির্জন সংঘারামের চারিধার থেকে রাজ-সমারোহ শীতের কুয়াশার মত মিলিয়ে গিয়েছে।

আবার পড়েছে কালের যবনিকা। দীর্ঘকাল সে যবনিকা আর ওঠেনি। সংঘারাম তখনই বুঝি ওই মাটির ঢিবিতে পরিণত। এখানকার অরণ্যে শুধু হিংস্র শ্বাপদ ঘুরে বেড়ায়। তারপর একদিন ভদ্রেশ্বরীর কেমন করে প্রতিষ্ঠা হয়েছে, সে সম্বন্ধে অস্পষ্ট কিংবদন্তী ছাড়া আর কিছুই জানবার উপায় নেই। সে কিংবদন্তী আর সমস্ত কিংবদন্তীর মতই সত্য-মিথ্যা-আজগুবি কল্পনায় মেশানো। কোন দূর দেশের উগ্র উদ্ধত এক সৈনিক, নিজের ভাইকে হত্যা করে, রাজার কোপ থেকে পালিয়ে, এই অরণ্যে বুঝি আশ্রয় নিয়েছিল। দীর্ঘ অবিরাম পর্যটনে ক্লান্ত ক্ষতবিক্ষত হয়ে ক্ষুধায় পিপাসায় যে তখন মুমূর্ষু। হঠাৎ সে দেখতে পায় পরমা সুন্দরী এক মেয়ে তার কাছে বসে তার মুখে অমৃতধারার মত মধুর জল ঢেলে দিচ্ছে। এই অরণ্যে সেই মেয়েটির সেবায় পরিচর্যায় সে ক্রমে সুস্থ ও সবল হয়ে ওঠে। কিন্তু তার পরেই তার স্বরূপ প্রকাশ পায়। এই সেবার প্রতিদানে জোর করে সে মেয়েটিকে সঙ্গে ধরে নিয়ে যাবার চেষ্টা করে। মেয়েটির কোন অনুনয় মিনতি সে শুনতে চায় না। তখন মেয়েটি হঠাৎ অমানুষিক শক্তিতে তার হাত থেকে মুক্ত হয়ে বজ্রস্বরে জানায় যে, ভাইয়ের রক্ত যে-হাতে এখনও লেগে আছে, সে-হাত তাকে স্পর্শ করবার

যোগ্য নয়। ক্রোধে কামনায় অন্ধ হয়ে সৈনিক তারপরও তাকে ধরবার চেষ্টা করে। তখন মেয়েটি ওই প্রাচীন বটের তলায় এক পাথরের মূর্তিতে পরিণত হয়ে তাকে জানিয়ে যায় যে, ভ্রাতৃহত্যার পাতক রক্তে না ধুয়ে ফেলা পর্যন্ত তার মার্জনা নেই। সেই পাথরের মূর্তিই ভদ্রেশ্বরী দেবী, আর সেই সৈনিকই সামনবেড়ের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা রাঘব সামন্ত। রাঘব সামন্তই এদিকের সমস্ত অরণ্যভূমি জয় করে সেখানে বিস্তীর্ণ জনপদের পত্তন করে। দেবীর নির্দেশ সে নাকি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিল। ভদ্রেশ্বরী মন্দিরের পথ প্রতিদিন অসংখ্য বলির রক্তে পিচ্ছিল না করা পর্যন্ত তার তৃপ্তি হত না। দেবীর অনুগ্রহেই বোধহয় তার সৌভাগ্য সূর্য দেখতে দেখতে চরম শিখরে উঠেছিল। সামনবেড়ের পরিধি তখন এই গ্রামটুকুর মধ্যেই আবদ্ধ ছিল না। রাঘব সামন্তের কাছে মাথা নিচু করেনি, এমন লোক এ-অঞ্চলে ছিল না।

রাঘব সামন্ত সম্বন্ধে আর কিছুই শোনা যায় না। কিন্তু সামন্তদের উত্থান ও পতনের ইতিহাস কিংবদন্তী-আকারে এখনও অনেকের মনে আছে। সামন্তদের প্রতাপ ও প্রতিপত্তি তারপর দিন দিন বেড়েই গিয়েছে। নামে রাজা না হলেও তারাই ছিল এ-অঞ্চলের একচ্ছত্র অধীশ্বর। সামন্তদের সৌভাগ্যের সঙ্গে ভদ্রেশ্বরীর মন্দিরেরও উন্নতি হয়েছে। সে-মন্দির বিরাট ও নতুন করে যিনি তৈরী করিয়ে তাতে সোনার চূড়া দিয়েছিলেন বলে প্রবাদ, সেই উদয়রাম সামন্তর পর থেকেই কিন্তু সামন্তদের পতনের সূত্রপাত। লোকে বলে উদয়রামের একমাত্র ছেলে নরহরি সামন্ত নাকি বংশের অযোগ্য, নেহাত অকর্মণ্য ভাল মানুষ ছিলেন। না ছিল তাঁর মধ্যে সামন্তদের তেজ-বীর্য, না তাদের বিষয় বুদ্ধি। চৌধুরীরা তখন থেকেই সামনবেড়ে একটু একটু করে শিকড় চালাতে শুরু করেছে। নরহরি বিষয়কর্ম

দেখেন না। দেখলেও বোঝেন কিনা সন্দেহ। সামন্তদের বিরাট প্রাসাদ তাঁর সময় থেকেই ধ্বংস হতে শুরু হয়েছে। প্রাসাদের সংস্কার করবার কোন উৎসাহ নরহরির ছিল না। তিনি তারই পাশে ছোট একটা কোঠাঘর তৈরী করিয়ে নিয়ে তাতেই নিতান্ত সাধারণ ভাবে বাস করতেন। লোকে অনুযোগ করলে হেসে বলতেন, অত অগুনতি ঘর নিয়ে থাকলে বার হব কোথায়!

নরহরির এসব পাগলামিতে হয়ত কিছু আসত যেত না। কিন্তু তাঁর এক সাংঘাতিক বাতিক ছিল। তিনি যত রাজ্যের বেদে ডাকিয়ে নানারকম বিষধর সাপের বিষ সংগ্রহ করতেন। কোথা থেকে তাঁর মাথায় এক অদ্ভুত খেয়াল ঢুকেছিল যে, এইসব সাপের বিষ থেকে তিনি এমন এক ওষুধ তৈরী করবেন, যা হবে মৃতসঞ্জীবনী। যাতে মরণ, তাতেই জীবন, এই ছিল তাঁর বুলি। সারা দিনরাত তাঁর বেদেদের সঙ্গে আর বিষ নিয়েই কেটে যেত। বিষ থেকে তিনি অমৃত ছেঁকে তুলবেন, পৃথিবীর সমস্ত আধিব্যাধি তাতে দূর হয়ে যাবে, এই ছিল তাঁর খ্যাপামি। তাঁর স্ত্রী একটি মাত্র সন্তান প্রসব করে মারা গিয়েছিলেন অনেকদিন আগে। ছেলেটিকে তার মামারা এই পাগল বাপের প্রভাব থেকে বাঁচাবার জন্য নিজেদের কাছে নিয়ে গিয়ে মানুষ করছিল। নরহরির বাতিকে বাধা দেবার সুতরাং আর কিছু ছিল না। সারাদিন তিনি নানারকমের বিষ জ্বাল দিতেন, কত কী মেশাতেন আর কী যে পরীক্ষা করতেন, কেউ তা জানে না। কিন্তু অমৃত আর তাঁর হাতে তৈরী হল না। শুধু 'নরহরির বড়ি' বলে এ-অঞ্চলের একটা কথা এখনও তাঁর ব্যর্থ সাধনার প্রতি বিদ্রূপ বহন করে আসছে। সামন্তদের বিরাট জমিদারিতে অনেক দিন থেকেই গোলমাল চলছিল। তারপর কয়েক বছর উপরি উপরি অজন্মা অনাবৃষ্টি হয়ে হঠাৎ দেখা দিল দারুণ দুর্ভিক্ষ। আগের বছর চাষীরা

মাঠ থেকে শুধু কটা শুকনো খড় ঘরে তুলে এনেছে। পেটের জ্বালায় বেশির ভাগ চাষী তাদের বীজধান খেয়ে শেষ করেছে। যারা উপোস করে এক বেলা খেয়ে বীজধান কোন মতে বাঁচিয়েছে, তারাও আকাশের দিকে হা-পিত্যেশ করে চেয়ে। জ্যৈষ্ঠ গিয়েছে, আষাঢ় মাস যায় যায়, আকাশ যেন দেবতার কোপদৃষ্টি, শুধু আগুন ঝরছে।

আকাশ যেমন শুকনো, ভদ্রেশ্বরীর মন্দির তেমনি রক্তে ভেসে যাচ্ছে। মেঘের জন্য জলের জন্য ভদ্রেশ্বরীর কাছে দিনরাত পূজা-মানতের আর বিরাম নেই। দেশে বলির জন্য ছাগল মহিষ দুর্লভ হয়ে এল। বিদেশী একদল বেদের সঙ্গে নরহরি বুঝি বেরিয়েছিলেন সুষণো ডাঙায় সাপের খোঁজে। তারা নাকি তাঁকে চন্দ্রচূড়ের টাটকা বিষ জোগাড় করে দেবে। বেরুবার পথে ভদ্রেশ্বরীর সামনে দিয়ে প্রণাম করে আসতে গিয়ে তিনি থমকে দাঁড়ালেন। রক্ত! রক্ত! চারিদিকে শুধু রক্ত! তার মধ্যে একটি পাঁচ ছ' বছরের ছোট উলঙ্গ মাঝিদের মেয়ের কান্না তাঁর কাণে তীক্ষ্ণ তীরের মত বিঁধল। ছোট একটা মিশ-কালো ছাগলছানা দু'হাতে জড়িয়ে ধরে সে হাপুস নয়নে কাঁদছে। ছাড়বে না সে, কিছুতেই তার ছাগল-ছানা ছাড়বে না। অনেকক্ষণ তার বাপ মা, আশপাশের লোক বুঝি বুঝিয়েছে। বলেছে, নতুন ছাগল-ছানা অমন কত হবে, একটার বদলে অনেক ছানা তাকে দেওয়া হবে। বোকা মেয়ে তবু অঙ্কের হিসেব বোঝে না। বিরক্ত হয়ে ছাগল-ছানাটাকে তারপরে তার হাত থেকে ছিনিয়ে নিল সবাই। স্বয়ং নরহরি সামন্ত উপস্থিত। পুরোহিত থেকে খাঁড়াধারী পর্যন্ত সবাই নিজেকে একটু বেশী করে জাহির করবার জন্যে ব্যাকুল। কে একজন ঠাট্টা করে শাসিয়ে গেল—আর কাঁদলে ও পাঁঠার সঙ্গে তাকেও বলি দেওয়া হবে।

মেয়েটা আর কাঁদল না। দাঁতে দাঁত চেপে সে বলির উদ্যোগ-অনুষ্ঠানের দিকে চেয়ে রইল একদৃষ্টে। অনুষ্ঠান সাঙ্গ হল। বলির পাঁঠার কপালে সিঁদুর লাগান হল, গলায় উঠল রক্তজবার মালা। তারপর নিপুণ হাতের এক কোপে যুপকাষ্ঠে গলানো পিছমোড়া-দিয়ে-টানা ধড় থেকে তার মাথাটা খসে পড়ল মাটিতে। ছুঁড়ে-দেওয়া রক্তাক্ত ধড়টা তখনও ছটফট করছে। মেয়েটা চীৎকার পর্যন্ত করল না, শুধু তার কোমল ছোট্ট মুখটা কেমন যেন একবার শিউরে সিঁটকে উঠল। তার মাকে কারা ধমক দিয়ে উঠল, "মেয়েটা সিটিয়ে গেল যে! জল দাও না মুখে! বলিহারি আক্কেল! আহ্লাদ করে অমন মেয়েকে সঙ্গে করে এনেছিলেই বা কেন?"

নরহরি সামন্ত সেখান থেকে ফিরে এলেন। তাঁর প্রণাম অনেক আগেই সারা হয়েছিল। কিন্তু এতক্ষণ তিনি কেন কে জানে সেখান থেকে নড়তে পারেননি।

পরের দিন সবাই স্তম্ভিত হয়ে শুনলে ভদ্রেশ্বরীর মন্দিরে বলি বন্ধ হয়ে গিয়েছে—নরহরির আদেশ। চারিদিকে আতঙ্কের সাড়া পড়ে গেল। কিন্তু নরহরির আদেশের নড়চড় হল না। নরহরির এইটিই নাকি চরম ও শেষ খ্যাপামি।

বৃষ্টি নেই। আকাশে মেঘ যদি বা দেখা দেয়, কোথা থেকে আগুনের হলকার মত ঝড় এসে তাকে উড়িয়ে নিয়ে যায়। লোকে বললে, ভদ্রেশ্বরীর শাপ লেগেছে। দেখতে দেখতে দুর্ভিক্ষের সঙ্গে মড়ক দেখা দিল। কাতারে কাতারে গ্রামে গ্রামে লোক মারা যেতে লাগল। বড় ছোট ইতর ভদ্র সবাই এসে ধন্না দিয়ে পড়ল নরহরির কাছে। ভদ্রেশ্বরীকে শান্ত করুন, আবার বলির আদেশ দিন।

নরহরি অটল। রক্তের দামে জল কিনব না, দেবীর কাছেও নয়, এই তাঁর বুলি।

হতাশ হয়ে সবাই ফিরে গেল। মড়ক সর্বনাশা রূপ ধরল। দেশে বুঝি আর মানুষ থাকবে না। দেবীর ভক্তদের মুখে শোনা গেল, বলি বন্ধ করার এতবড় অপমান, দেবী কখনও ক্ষমা করবেন না। যদি ক্ষমা করেন তবে ছাগরক্তে আর নয়। নররক্ত চাই।

দেশব্যাপী হাহাকার। নরহরি বাইরে বার হতে পারেন না। শ্মশান আর গ্রাম এক হয়ে গিয়েছে। ঘরের মধ্যেও তাঁর নিশ্চিন্ত মনে অমৃত-গবেষণার উপায় নেই। ক্ষুধার্ত রোগোন্মত্ত গ্রামবাসীর দল তাঁর ঘর পর্যন্ত চড়াও হয়ে আসে। ভদ্রেশ্বরীর প্রৌঢ় পুরোহিত একদিন ঝড়ের মত এসে উপস্থিত হলেন। উন্মাদের মত তাঁর চেহারা, মহামারীতে তাঁর স্ত্রী-পুত্র-পরিবার সব নিয়ে শুধু তাঁকে ফেলে গিয়েছে। পুরোহিত ক্ষিপ্তভাবে যেন অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করে, নরহরিকে বললেন, "তুমি নাস্তিক, তুমি পাষণ্ড, তুমি বংশের কলঙ্ক, বামাচারী পিশাচ। সমস্ত দেশ তুমি শ্মশান করে দিয়েছ নিজের দম্ভে। তবু কি তোমার তৃপ্তি নেই? দেবী রক্ত চান। এখনও হয়ত সময় আছে। এখনও তাঁকে তুষ্ট কর। নইলে কেউ রক্ষা পাবে না।"

পুরোহিত আরও অনেক কিছু বললেন। অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে নরহরি বললেন, "আপনি যান, দেবীকে আমি তুষ্ট করব।"

তার পরদিনই সকালে নাকি নরহরির মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছিল, দেবীর মন্দিরে, তাঁর গর্ভগৃহের সামনে। কেউ বলে তিনি নিজের হাতে নিজের শিরশ্ছেদ করেছিলেন, কেউ বলে যে-বিষ তিনি অমৃতে রূপান্তরিত করতে চেয়েছিলেন, তারই পাত্র ছিল নাকি তাঁর হাতে।

দেবী তুষ্ট হলেন কিনা বলা যায় না। কিন্তু বৃষ্টি হল একেবারে

আকাশ ভেঙে অবিরাম। অতিবৃষ্টিতে দেশ ভেসে গেল। সেই সঙ্গে সামন্তদের সমস্ত আধিপত্য-গৌরব।

নরহরির যে ছেলে মামার বাড়িতে মানুষ হচ্ছিল তাকে গ্রামে ফিরিয়ে এনে নরহরির শ্বশুরকুল অনেক চেষ্টা করলে এ-ভাঙনকে ঠেকাবার, কিন্তু বন্যা বাঁধ মানলে না। দেশের চেহারা চারিদিকে তখন বদল হচ্ছে। ঢাকা- থেকে দেওয়ানী দপ্তর সরে এসেছে মুর্শিদাবাদে। চৌধুরীরা ভাল করেই মাথা চাড়া দিয়েছে। মুর্শিদাবাদের রায়-রায়ানের দপ্তরে তাদের সৌভাগ্যের সূত্রপাত। সেখান থেকে মুকুন্দরাম চৌধুরী নতুন ফারসী বয়েত আর তার চেয়ে বেশী জৌলুসের বাদশাহী মোহর আমদানি করে সামন-বেড়ের চাকা একেবারে অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিলেন। সামনবেড় থেকে এর আগে কেউ আর ম্লেচ্ছ যবনের চাকরি করতে চায়নি। কিন্তু মোহরে সব দোষ খণ্ডায়, দেখতে দেখতে সামন্তদের তালুক মুলুক একে একে চৌধুরীদের হাতে গিয়ে উঠল। স্বয়ং ভদ্রেশ্বরীও ভাগ্যবানের উপর গিয়ে ভর করলেন। ধ্বসে-যাওয়া ভাঙা ভিটেতে আরও কয়েক পুরুষ সামন্তদের সন্ধ্যে-প্রদীপ টিম টিম করে জ্বলল। তারপর একদিন আর সে-আলো দেখা গেল না। বছর সত্তর-আশি আগে দীননাথ সামন্ত তাঁর স্ত্রীকে এখানকার শ্মশানে রেখে সদ্যোজাত শিশুটিকে নিয়ে এই পোড়ো ভিটে ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। তারপর আর তাঁদের কথা সামন-বেড়েতে শোনা যায়নি। সামন্তদের বিরাট বাসভূমির ধ্বংসাবশেষ জঙ্গলে ঢেকে গিয়ে বিষাক্ত সাপ ও গ্রামবাসীর কল্পনায় তার চেয়ে ভয়ঙ্কর অপদেবতার আশ্রয় হয়ে উঠেছে।

ভদ্রেশ্বরী চৌধুরীদের উপর অনুগ্রহ করে আসছেন সেই থেকে। তাঁর বলি নরহরির মৃত্যুর পর থেকেই আবার প্রচলিত হয়েছিল। কিন্তু বেশী দিনের জন্য নয়। দীননাথ সামন্ত যখন সামনবেড়ে

ছেড়ে যান, তার আগেই চৌধুরীদের পূর্বপুরুষ রামদয়াল চৌধুরী বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা নিয়েছেন। ভদ্রেশ্বরীর মন্দিরে রক্তপাত তখন থেকে বন্ধ। ছাগশিশুর বদলে সেখানে কুমড়ো বলি হয়। শ্যামসুন্দরই এখন চৌধুরীদের প্রধান উপাস্য। কিন্তু ভদ্রেশ্বরীর অপমানিত বোধ করার কোন লক্ষণই নেই। দুর্ভিক্ষ ত লাগেনি, মহামারীও নয়। চৌধুরীদের দিন দিন সব দিক দিয়ে বাড়বাড়ন্তই দেখা যাচ্ছে।

অমলের হঠাৎ যেন চমক ভাঙল। রবি, বামুন-পুকুরের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে তাকে ডাকছে, "কী রে, ডবল পাহারা দেবার মতলব নাকি। বাড়ি ফিরতে হবে না?"

দলের সবাই এগিয়ে গিয়েছে যে যার বাড়িতে। একা রবিই দাঁড়িয়ে আছে তার অপেক্ষায়। দাঁড়িয়ে থাকাটা নিছক বন্ধু-প্রীতি নয়। দুজনে এক পাড়াতেই থাকে বটে তবে বড় রাস্তা থেকে যে পথটা মনসাতলা দিয়ে তাদের বাড়ির দিকে গিয়েছে সেখানে রবির আর-একটা ভয়ের জায়গা আছে। হারান-বুড়ো মরবার পর থেকে তার বাড়ির পাশে বাদামতলায় ডোবার কাছটা নাকি মোটেই নিরাপদ জায়গা নয়। বুড়ো হারান নাকি অনেক টাকা গোপনে কোথায় পুঁতে রেখেছিল। মরবার সময়, এতদিন ধরে যার সেবা খেয়েছে, সেই একমাত্র উত্তরাধিকারিণী বিধবা ভাগনীকে সেই পোঁতা টাকার গোপন সন্ধান দিতে গিয়ে কিছুতেই নাকি জায়গাটা সে নিজেই মনে করতে পারিনি। এমনি তার তখন ভীমরতি। সেই আফসোস নিয়ে মরে, সে নাকি এখনও সেই গুপ্তধনের সন্ধানে রাত্রে এই বাদামতলার ডোবার পাশে ঝোপে ঝাড়ে ঘুরে বেড়ায়। রবি রাত্রে তাই পারতপক্ষে সেখান দিয়ে একলা যায় না। দুজনে নিঃশব্দেই আগু-পিছু সঙ্কীর্ণ পথটা পার হয়ে যাচ্ছিল। চাঁদ এখন আরও খানিকটা উপরে উঠে এসেছে। ক্ষীণ জ্যোৎস্নালোকে

ঝোপঝাড় গাছের ছায়ায় পথটা আলো-আঁধারী। হঠাৎ পেছন থেকে রবি অমলের জামাটা টেনে ধরে ভীত অস্ফুট গলায় বলে, "দেখেছ!"

অমলও থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। ভয় তার একেবারে নেই তা নয়, কিন্তু রবির মত এমন 'আটাশে' তাকে বলা যায় না। কিন্তু সত্যিই বাদামতলার ডোবার ধারে একটা অস্পষ্ট মূর্তি যে দেখা যাচ্ছে!

খানিক দুজনেই চুপ করে থাকে। তারপর মূর্তিটা একটু নড়তেই অমল হাঁক দেয়, "কে? কে ওখানে?" ভিতরের অস্পষ্ট ভয়ের দরুণই তার হাঁকটা একটু বেশী জোরেই বার হয়।

ডোবার ধার থেকে মূর্তিটা এবার তাদের দিকেই আসতে আসতে বলে, "আমি গো আমি। দাগী চোর; ধরবি নাকি?"

এবার রবিই লজ্জিত হয়ে বলে, "আরে, সিধু খুড়ো! দেখেছ খ্যাপার কাণ্ড!" গলাটা চড়িয়ে সে তারপর বলে, "এত রাত্রে ঝোপে জঙ্গলে কী করছ সিধু খুড়ো?"

"চুরি করছি বাবা, চুরি করছি—আমায় ধরে নিয়ে যাবি না?" সিধু খুড়ো তাদের সামনে এসেই দাঁড়ায়। এই শীতেও কোমরে একটা খাটো কাপড় ছাড়া আর কিছু তার গায়ে নেই। আবছা অন্ধকারে দাড়িগোঁফ সমেত দীর্ঘ চেহারাটা সত্যি ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে।

ভয় করবার তাকে কিন্তু কিছু নেই। অমল হেসে বলে, "ধরব কী করে? হাতকড়া নেই যে!"

"তবে কী ছাই তোদের রাত-পাহারা! রাতে নয় বাবা, রাতে নয়—পাহারা দেবে দিনমানে। যত চুরি সব দিনের বেলায়।" সিধু খুড়ো নিজের মনেই বকতে বকতে চলে যায়।

রবি ও অমল একটু হেসে আবার এগিয়ে চলে। পিছন থেকে হঠাৎ বেসুরো কর্কশ গলায় সিধু খুড়োর গান শোনা যায়—

তোর বিচারের এমনি মজা,
সাবাস হল দিনের চুরি
শুধু রাতের চুরির বেলায় সাজা!

রবি সসম্ভ্রমে বলে, "সিধু খুড়ো অমনি খ্যাপা সেজে থাকে, বুঝেছিস। আসলে ও সিদ্ধ পুরুষ! মুখে মুখে যখন-তখন কী রকম গান বাঁধে দেখেছিস।

পথে প্রথমেই রবিদের বাড়ি পড়ে। সে বিদায় নিয়ে চলে যায়। অমল খানিকটা এগিয়ে গিয়ে নিজেদের বাড়ি ঢোকে। বার-বাড়ির উঠানে অনেকগুলি গরুর গাড়ি বিরাট ফড়িংএর মত ল্যাজ উঁচু করে দাঁড়িয়ে। মধুবন থেকে প্রজারা বৎসরের বরাদ্দ কাঠ এনেছে। এখনও মাল খালাস হয়নি। আশপাশের গরুগুলোর ভারী নিঃশ্বাসের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। তারই সঙ্গে মানুষের নাক ডাকার শব্দ। বার-দালানের বারান্দায় গাড়োয়ানরা যে যেখানে পেরেছে, কাঁথা কম্বল মুড়ি দিয়ে ঘুমোচ্ছে।

বার-দরজাটা ভেজানই ছিল। দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকে পুরনো আমলের সংকীর্ণ সিঁড়ি দিয়ে অমল নিজের ঘরের দিকে চলে।

সারা বাড়ি নিশুতি। অমল খেয়েদেয়েই রাত-পাহারায় বেরিয়েছিল। সুতরাং তার জন্যে কেউ অপেক্ষা করে নেই। কিন্তু উপরের বারান্দায় ঢোকবার মুখেই দরজায় আলো দেখা যায়। সঙ্গে মৃদু চুড়ির আওয়াজ। অমল জিজ্ঞাসা করে, "কে? মঞ্জু নাকি?"

মৃদু হাসির সঙ্গে শোনা যায়, "কটা ডাকাত ধরে আনলে গো অমল দা!"

অমল দাঁড়িয়ে পড়ে হেসে বলে, "ধরেছিলাম একটা। আনতে পারলাম না।"

"কাকে গো?"

"আমাদের সিধু খুড়োকে।"

মঞ্জরীর মুখে এবার সত্যি উদ্বেগ দেখা যায়। বলে, "সিধু খুড়ো বুঝি আবার গাঁয়ে এসেছে! এতদিন কোন শ্মশান-মশানে ছিল কে জানে! কিন্তু ওকে যেন কিছু বোলো না। জান ত, ও পিশাচসিদ্ধ কাপালিক, রাগলে কী না করতে পারে!"

অমল হেসে বলে, "আচ্ছা, উপদেশটা মনে রাখব। কিন্তু এত রাত পর্যন্ত তুই জেগে যে?"

"কী করব বল, দুপুর-রাতে ছ'গাড়ি কাঠ নিয়ে এল, গাড়োয়ান-গুলোকে ত আর উপোস করিয়ে রাখতে পারি না। এইত খানিক আগে সব পাট চুকল! তারপরও কি নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোতে যাবার যো আছে—পাশের বাড়িতে যদি ডাকাত পড়া সোরগোল হয়।"

"ডাকাত পড়া সোরগোল আবার কিসের!"

"কুমুদ ডাক্তারের দরজায় দুম দুম করে লাথি গো—ওই সেই ভুতুড়ে বাড়ির নেপালী চাকরটার কীর্তি।"

"নেপালী নয় সে, বর্মী," অমল শুধরে দিয়ে বলে, "কিন্তু রাত-দুপুরে ডাক্তারের বাড়িতে কেন! কারুর অসুখ নাকি?"

"হবে নিশ্চয়। কুমুদ ডাক্তার ত প্রথম বেরুতেই চায় না। আর তারই বা দোষ কী! রাত-দুপুরে সামন্তদের সেই ভুতুড়ে ভিটেতে কেউ সাধ করে যায়!"

"ডাক্তার গেছে ত শেষ পর্যন্ত?" অমল একটু কৌতূহলী হয়েই জিজ্ঞাসা করে।

"পাগল! সে আবার যায়। সে নিজে বলে বাতে পঙ্গু।

এই শীতের রাতে আধ ক্রোশ হেঁটে সেই ভাঙনে যাবে। সব শুনে-টুনে কী-একটা ওষুধ দিয়ে বললে, সকালে যাবে।"

তাচ্ছিল্যভরেই প্রসঙ্গটা শেষ করে মঞ্জরী বলে, "তোমার গরম জল দরকার থাকে ত বল, এখনও উনুনে আঁচ আছে।"

অমলের শরীর খুব সবল নয়, কিন্তু উৎসাহটা সব সময়ে স্বাস্থ্যের মাত্রার খেয়াল রাখে না। পরে ধাক্কা সামলাতে তাই তাকে অনেক কিছু করতে হয়। শীতের রাতে পাহারা সেরে এসে এক-একদিন ঠাণ্ডা লাগার ভয়ে সে গরম জলে নুন দিয়ে কুল্লা করে। অবশ্য মঞ্জরীর কৃপাতেই গরম জল জোগাড় হয় অত রাত্রে।

আজ কিন্তু ওসব দিকে অমলের মন নেই। সে মাথা নেড়ে জানায় গরম জল তার আজ লাগবে না। তারপর একটু অপ্রসন্ন স্বরে বলে, "কুমুদ ডাক্তারের কিন্তু যাওয়া উচিত ছিল। অতরাত্রে ডাকতে এসেছিল, কিছু বিপদ নিশ্চয় হয়েছে।"

মঞ্জরীর কিন্তু রোগীর চেয়ে ডাক্তারের উপরেই সহানুভূতি বেশী। বলে, "ডাক্তারেরও ত মানুষের শরীর। বুড়ো বেতোরোগী ঠাণ্ডা লাগিয়ে মারা পড়বে নাকি।"

কথাটা তারপর ঘুরিয়ে মঞ্জরী বলে, "তোমার মশারি আমি ফেলে গুঁজে দিয়ে এসেছি। যাও শুয়ে পড়গে। আর মাথার দিকের জানালাটা যেন খুলো না আবার।"

বাতিটা হাতে নিয়ে মঞ্জরী নীচে চলে যায়।

বিছানায় শুয়ে অমলের কিন্তু প্রথমটা ভাল করে ঘুম আসে না। আধ-তন্দ্রায় আচ্ছন্নতার মধ্যে অসংলগ্ন চিন্তার জট্। ভদ্রেশ্বরী······পিশাচসিদ্ধ সিধুখুড়ো......অমৃতসন্ধানী নরহরি······ সামন্তদের ভুতুড়ে ভিটের অপরিচিত বুড়ো আর তার মেয়ের রহস্য··· ··কে জানে কার গুরুতর অসুখ হয়েছে হঠাৎ······কুমুদ ডাক্তার ছাড়া গাঁয়ে আর ডাক্তার নেই......ডাক্তার একজন

এখানে অত্যন্ত দরকার। পাশ করে এসে সেও ত গাঁয়েই বসতে পারে ·····না তা হবার নয়... ..বড় সঙ্কীর্ণ জীবন······চারি ধারে বেড়া দেওয়া......অদ্ভুত মেয়ে মঞ্জরী, সেবায়, যত্নে, শুশ্রূষায়, মায়া, মমতায়, তার তুলনা মেলে না। একা এই এত বড় সংসার সেই চালায় বললে হয়। যাকে সে চোখে দেখতে পায়, হক সে সামান্য অচেনা গরুর গাড়ির গাড়োয়ান, তার জন্যে কোন পরিশ্রম কোন কষ্ট সে গ্রাহ্য করে না। কিন্তু তার নিজের ছোট গণ্ডির বাইরে যাকে সে চোখে দেখেনি, তার কোন দাম তার কাছে নেই। হক সে অসহায় বিপন্ন ·····হক সে অসুস্থ......

অনেক রাত্রে শুয়েছে। সকালে অমলের ঘুম ভাঙল একটু বেলায়। মঞ্জরী হাত গুনতে জানে বোধ হয়। তার ঘুম ভাঙতে না ভাঙতে চায়ের বাটি নিয়ে সে ঘরে ঢুকল।

চায়ের বাটিটা তেপয়ের উপর রেখে মশারি গুটোতে গুটোতে সে বললে, "তোমার আর রাত পাহারায় যেতে হবে না বাপু। বেলা নটা পর্যন্ত ঘুম। এতে শরীর খারাপ হয় না?"

মশারি গুটিয়ে বিছানা তুলে মঞ্জরী চলে গেল।

চায়ের পেয়ালা তুলে নিয়ে অমল তখন জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। বেলা অনেকটা হয়েছে বটে, শরীরেও কেমন একটা জড়তা তবু শীতের সকালের রোদটা কী মিষ্টিই না লাগছে। দূরে চৌধুরীদের শ্যামসুন্দরদের রাসমঞ্চের চুড়োটা আম-কাঁটালের বনের মাথায় ঝকঝক করছে সোনালী রোদে। আর একদিকে কুমুদ ডাক্তারের দোতলা দালান আর তাদের বার-বাড়ির দেয়ালের ফাঁক দিয়ে সুদূর দিগন্তের একট ফালি দেখা যাচ্ছে—ধান-কেটে-নেওয়া শূন্য মাঠ, তার ওপারে সুষ্‌নো ডাঙার রাঙা মাটির ঢেউ। এখানে-ওখানে ছড়ান বাবলা-বন যেন আকাশে সেই ঢেউয়ের

ছিটে। কী অপরূপই লাগছে শীতের এই প্রসন্ন নীল আকাশের তলায়। পৌষের আকাশের চোখে মধুর একটি পরিতৃপ্তি। ঘরে ঘরে সে মরাই ভরে দিয়েছে ধানে। অতি দুঃখীর মুখেও হাসি ফুটিয়েছে দুদিনের···

অমল মুখ-হাত ধুয়ে চৌধুরীদের বাড়িতেই একটু যাবার উদ্যোগ করছে, এমন সময় মোহিত এসে বলে, "বোয়ানবাদী যাবে অমলদা, চল যাই। শিউলিরা কাল নতুন 'লবাৎ' তৈরী করেছে, নিয়ে আসব।"

অমলের এসব ব্যাপারে উৎসাহ নেই। তবু মোহিতের আগ্রহ দেখে তাকে নিরাশ করতে তার ইচ্ছে করে না। আপত্তি না করে মোহিতের সঙ্গেই সে বেরিয়ে পড়ে। বাড়ির উঠোন দিয়ে যাবার সময় খিড়কি-পুকুরে চুবড়ি হাতে মাছ ধুতে যেতে যেতে মঞ্জরী বলে, "অমলদাকে নিয়ে বেরুচ্চ, আজ কিন্তু সেদিনকার মত বেলা দুপুর কোরোনা ছোড়দা। শীতের দিনে ভাত তরকারি সব জল হয়ে থাকবে!"

"আচ্ছা আচ্ছা, তোকে আর মুরব্বিয়ানা করতে হবে না।" মোহিত তাচ্ছিল্যের স্বরেই বলবার চেষ্টা করে, কিন্তু সুরটা তার নরম।

মোহিত মঞ্জরীর বড় ভাই,—বছর কয়েকের বড়। কিন্তু বেঁটে খাটো ম্যালেরিয়ায় শীর্ণ চেহারা—দেখায় যেন মঞ্জরীর ছোট। মঞ্জরীকে আর সবাইকার মত সেও একটু সমীহ করে চলে। মোহিতকে দেখলে অমলের সত্যি কেমন মায়া হয়। একেবারেই পাড়াগাঁয়ের ছেলে, চেহারায় চিন্তায় পোশাকে-আশাকে সব বিষয়েই কেমন একটা জড়তা। লেখাপড়া করবার বেশী সুযোগ তার হয়নি। সাংসারিক অভাব, তার উপর রোগ তার লেগেই আছে। বাড়ির আর সবাইকার চেয়ে ম্যালেরিয়া যেন তাকেই

বেশী করে পেয়ে বসেছে। হেমন্ত গিয়ে শীত এসেছে, তবু এখনও ঘুরে-ফিরে সে জ্বরে পড়ছে। সুস্থ থাকলে চাষ-আবাদ জমি-জমা সে একটু-আধটু দেখা শোনা করে। সে-বিষয়ে তার উৎসাহ কিন্তু যথেষ্ট। জমিজমা চাষবাস সংক্রান্ত এত খুঁটিনাটি সে জানে যে, অমলের অবাক লাগে। মনে হয় এই পাড়াগাঁয়ের জগৎই বুঝি তার সব। তাই নিয়েই সে খুশী। কিন্তু আসলে সে তা নয়, এইখানেই মুশকিল। মোহিত শহরে যেতে চায়, কলকাতাই তার কল্পনার স্বর্গ। সেখানে সে একটা পানের দোকান দেবে, না হয় অফিসে বেয়ারাগিরি করবে—তবু এই গ্রামে সে পচে মরবে না। কী আছে এখানে? সকাল থেকে সন্ধ্যা, দিন থেকে মাস, মাস থেকে বৎসর, সব এখানে নির্দিষ্ট বাঁধাধরা। বড় জোর কোন বছর বৃষ্টি হবে বেশী, কোন বছর হবে না। কোন বার আখ ফলবে ভাল, কোন বার ধান, কখন ধানে পোকা লাগবে, কখন বেগুনের গোড়া যাবে পচে। বর্ষায় আগাছার জঙ্গল বাড়বে, ঘরে ঘরে ম্যালেরিয়া দেখা দেবে লোকে ভুগবে, মারা যাবে, সেরে উঠবে। বুড়োরা সারা শীত কাশবে আর একটু একটু করে বিশাই নদীর ধারের শ্মশানের দিকে এগুবে। সেই ত তাদের জীবনের সীমানা। না, মোহিত এখানে কিছুতেই থাকতে চায় না। এখানে সব কিছু তার মুখস্থ হয়ে গিয়েছে, কার ক্ষেতে কত ধান, কার বরোজে কত পান, কোন গাছের জাম আগে পাকবে, কার পুকুরের জল আগে শুকোবে, কিছুই তার আর জানতে বাকি নেই। সে তাই অজানা রহস্যময় সেই অদ্ভুত রূপকথার পুরীতে যেতে চায়, সেখানে প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে আশ্চর্য কিছু, অবিশ্বাস্য কিছু, ঘটে যাওয়া মোটেই অস্বাভাবিক নয়। যেখানে সে মোটরে চাপা যেতে পারে, হয়ত মোটরে চড়তেও পারে, ফকির হতে পারে কিংবা হঠাৎ এক লহমায় আলাদীনের প্রদীপ পেয়ে যেতে পারে। যেখানে প্রতিদিন সেই

এক চেনা মুখ ঘুরে-ফিরে দেখতে হয় না, যেখানে অন্তহীন আকস্মিকতা, যেখানে চমকের অফুরন্ত মিছিল।

অমলের সঙ্গে যাবার জন্যে তাই সে এত লালায়িত। অমল সেই কল্পনার স্বর্গের প্রতিনিধি। ইচ্ছা করলে সে তাকে একটা কাজ কি সেখানে দিতে পারে না? একটা কোন সুযোগ, শুধু একটু দাঁড়াবার জায়গা। আজও সে একবার কথাটা পাড়ে। অমল হেসে বলে, "পাগল, এখন কেউ যায়! লোকে বলে সেখান থেকে পালাতে পেলে বাঁচে।"

মোহিত কিন্তু সে-কথা বোঝে না। কলকাতা থেকে পালিয়ে আসা তার কাছে একটা অর্থহীন ছেলেমানুষি। বোমার ভয় তার নেই, বোমা কী জিনিস সে কল্পনাই করতে পারে না ভাল করে। সামনবেড়ের উপর দিয়ে মাঝে মাঝে এরোপ্লেন উড়ে যায়—সে দেখেছে। সে এরোপ্লেন ত একটা পরম বিস্ময়ের বস্তু! লোকে বলে, সেই এরোপ্লেন উড়ে আসবে ঝাঁকে ঝাঁকে, তা থেকে বাজের মত বোমা পড়বে, শহর ফেটে চৌচির। এমন দৃশ্য দেখবার জন্যে এই ম্যালেরিয়ায় জীর্ণ জীবনটার সে তোয়াক্কা রাখে নাকি? তা ছাড়া শহরে কেউ আর নেই। যারা পালাবার তারা পালিয়েছে, তবু শহর ত চলছে। সেই শহরেই সে যেতে যায়। লেখাপড়া সে ভাল জানে না, পরিশ্রম করবার তার তেমন ক্ষমতা নেই,—না থাক, তবু সেখানে একবার যেতে পারলে সে একটা পথ খুঁজে বার করবেই। সাধন তেলীর ছোট ছেলেটা যে সেবার পালিয়ে গিয়েছিল, লেখা-পড়া সেই বা কী জানে। শরীরও তার এমন কিছু সবল নয় মোহিতের চেয়ে। তবু সেও ত সেখানে একটা কাজ জোগাড় করে নিয়েছে, কী একটা পাঁউরুটি-বিস্কুটের দোকানে। মোহিত কি তার চেয়ে অযোগ্য! অমলদা ইচ্ছা করলেই তাকে একটা চিঠি লিখে দিতে পারে, তার কত চেনা লোক সেখানে!

অমল হেসে তাকে আশ্বাস দেয়, আচ্ছা আর দু দিন যাক, যুদ্ধটা কোন দিকে যায় দেখা যাক্, সে-ই তাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবে!

মোহিতের জন্যে অমলের সত্যি দুঃখ হয়। কেন তার মধ্যে এই অদ্ভুত আত্মঘাতী দুরাশা। কলকাতা যে কী, তা তার ধারণাই নেই। তার মত ছেলে সেখানে কী করতে পারে! নির্বিকার নির্মম মহানগরের বিরাট রথচক্রে তার মত কত নিষ্ফল জীবন প্রতি-দিন গুঁড়িয়ে ধুলো হয়ে যাচ্ছে সে জানে না। কলকাতা মোহিতের কাছে হয়ত একটা বিরাট মুক্তি! সে ত জানে না সেখানে আকাশ কত ছোট হতে পারে—এই গাঁয়ের চেয়ে কত সঙ্কীর্ণ!

অবশ্য এখানেও মোহিতের মত ছেলের জীবন ঈর্ষা করবার মত নয়, অমল বোঝে। অত্যন্ত দুঃস্থ দরিদ্র পরিবার। জমি-জমা কিছু তাদের নেই বললেই হয়। রুগ্ন স্বামী মারা যাবার পর অনাথ ছেলেটি ও মেয়েটি নিয়ে মোহিতের মা অকূল পাথারে পড়েছিলেন। অমলের মায়ের সঙ্গে তাঁর দূর সম্পর্কের কী রকম একটা সম্বন্ধ আছে। অমলরা বহুদিন থেকে গ্রামছাড়া, কালে ভদ্রে গাঁয়ের বাড়িতে আসে। খেত-খামার থেকে ঠিকমত আদায় হয় না, বাগানের ফলমূল যে পারে লুটে খায়। তাই, মোহিতদের দুঃখ দেখে বিশেষ করে নিজেদেরও বাড়ি-ঘর ক্ষেত-বাগান দেখাশুনো হবার সুবিধে হবে বলে অমলের মা তাদের এ-বাড়িতে এসে থাকতে দিয়েছেন। সে প্রায় বছর আষ্টেক হল। মোহিতদের তাতে অন্নকষ্টটা ঘুচেছে। অমলদের গাছের যা কিছু ফল ফসল তারাই ভোগ করে। অমলদের তাতে আপত্তি নেই। গাঁয়ের বাস তারা ছেড়েই দিয়েছে। এবার বিপদে পড়েই নেহাত এখানে আসা। ঈর্ষাতুর গাঁয়ের লোক অবশ্য কলকাতায় গিয়ে মোহিতের মার নামে তাদের কাছে লাগাতে কসুর করে না। অমলদের জমিজমা থেকে

তিনি নাকি বেশ দুপয়সা করে নিচ্ছেন। নিজেদের বাপ পিতাম'র সম্পত্তি এভাবে লুট হতে দেওয়া তাদের উচিত নয়, ইত্যাদি। অমলের মা সামনে তাদের প্রতিবাদ করেননি। পরে হেসে বলেছেন—একজনের বদলে সবাই লুট করে খেলে বোধহয় আমার বেশী সুখ হত! না, আপাতত মোহিতদের ভাবনার কোন কারণ নেই। অমল বা তার মা, মোহিতদের পারতপক্ষে আশ্রয়চ্যুত করবেন না। তাঁদের দরকারই বা কী? শহরের বাড়িঘর ছেড়ে গ্রামে এসে বাস করবার কোন ব্যাকুলতা তাঁদের নেই। আপাতত বাধ্য হয়েই ক'দিনের জন্যে এসেছেন। মোহিতরা যতদিন খুশী এখানে থাকতে পারে। কিন্তু হাজার হলেও পরের বাড়ি, ঘর, সম্পত্তি। চেষ্টা করলেও একেবারে সে-কথা ভুলতে পারা বোধহয় সম্ভব নয়। সুতরাং মোহিতের কোনদিকে কি আশা করবার আছে? প্রত্যক্ষ না হলেও পরের অনুগ্রহের ওপর নির্ভর। তার ওপর মঞ্জরীর বিয়ের ভাবনা। পাড়াগাঁয়ের হিসেবে তার বিয়ের বয়স অনেক দিন পার হয়ে গিয়েছে। আগেকার দিন হলে কথা উঠত, আজকাল ঘরে ঘরে একই অভাবের সমস্যা। তাই কোনরকমে মুখ বন্ধ আছে। কিন্তু আর বেশী দিন থাকবে না।

অমলের মনটা কেমন খারাপ হয়ে যায়। প্রথম ঘুম ভেঙে ওঠার সে-প্রসন্নতা কখন গেছে হারিয়ে। গাঁয়ের সে নির্লিপ্ত চোখে-দেখা রূপ আর নেই। পদে পদে এঁদো ডোবা আর ঝোপ-ঝাড় জঙ্গলের পাশ দিয়ে যেতে যেতে গ্রামকে এখন অন্য-রকমই দেখায়। রাত্রের সে রহস্য-মায়াও নেই মনকে আচ্ছন্ন করে রাখবার। নোংরা এলোমেলো উদ্দেশ্যহীন ভাবে সাজান ঘরবাড়ির জটলা। না আছে শ্রী, না ছাঁদ। বেশির ভাগই অস্পষ্ট হাড়-বার-করা নোনা-ধরা ইটের ধ্বংসাবশেষ, ডাইনে বাঁয়ে

পানায় পচা ডোবার বিষ-নিশ্বাসে ধুঁকছে। এই নাবাল স্যাঁত-সেতে জমি শুধু চাষেরই উপযুক্ত। কতবার অমলের মনে হয়েছে এ-গ্রামের যারা পত্তন করেছিল তারা পাশেই সুষনোডাঙার উঁচু শুকনো রাঙামাটি ছেড়ে এই অস্বাস্থ্যকর নিচু জমিতে কী জন্যে প্রথম ভিত গেড়েছিল। শুধু বোধ হয় জলের সুবিধের জন্যে। মাটি আঁচড়ালেই যেখানে জল ওঠে সেই তাদের কাছে স্বর্গ। তারা আশু সুবিধেটাই দেখেছে, ভবিষ্যৎ বিপদটা ভাবেনি। কিংবা তাদের এ-বিষয়ে কোন ধারণাই ছিল না। নিজেদের চাষ-আবাদের মাঝখানেই তারা থাকতে চেয়েছে, চোর ডাকাতের ভয়ে বাড়িগুলো গায়ে গায়ে ঘেঁষাঘেঁষি করে তাল পাকিয়ে উঠেছে, মাটির বিস্ফোটকের মত। কারণে অকারণে যেখানে সেখানে তারা ডোবা কেটেছে ভবিষ্যৎ সর্বনাশের রাস্তা প্রশস্ত করতে।

গ্রামের সীমানা পেরিয়ে তারা এখন সুষনোডাঙার কাছাকাছি এসে পড়েছে। সুষনোডাঙার এই দিকটায় কিছুদিন থেকে ক'ঘর সাঁওতাল এসে বসতি করেছে। গাঁয়ের কুশ্রীতার পাশে তাদের ঝকঝকে তকতকে শুকনো নিকানো উঠোন, ছোট্ট কুঁড়েগুলির পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রূপ বড় বেশী চোখে পড়ে। সাঁওতালরা গরিব। গাঁয়ের নেহাত নিরেস অকেজো জমি তারা ভাগে চাষ করতে পায়, কেউবা অতি সামান্য মজুরিতে লোকের বাড়ি খাটে। কিন্তু তবু তাদের জীবনে কেমন একটি সহজ স্বাভাবিক শ্রী আছে। জীবনের কী যেন একটা সহজ মন্ত্র তারা জানে। বাউরিদের মত তাদের দারিদ্র্য কুৎসিত হয়ে ওঠে না কখনও। জীবনকে সুন্দর করে রাখতে বেশী কিছু উপকরণ ত তাদের লাগে না। দুটো বনের ফুল, একটা বাঁশের বাঁশি, হাতে-বোনা তাঁতের একটা মোটা কাপড় কি শাড়ি, আর কিছু তাদের দরকার নেই। তাই দিয়েই তারা নিজেদের জীবনকে মধুর একটি সৌষ্ঠব দিতে

পারে। পরিশ্রম আর অবকাশকে কী সহজ রঙিন ছন্দে তারা মিলিয়ে দেয়! জীবনের এই সহজ মন্ত্র তারা কোথা থেকে পেয়েছে কে জানে। কোন সুদূর সহজ এক বিস্মৃত সভ্যতার ধারা হয়ত আজও তাদের মধ্যে বইছে। সে-সভ্যতায় উপকরণের বাহুল্য ছিল না, ছিল না নিরর্থক জটিলতা। সুদূর অতীতে কাঁকর-পাহাড়ের রাঙামাটির দেশে যারা বড় বড় পাথরের চাঁই দিয়ে 'ডলমেন' সাজিয়েছিল অজানা দেবতার উদ্দেশে, প্রথম যারা মাটির গর্ভ থেকে তামা আঁচড়ে তুলেছে, পৃথিবীময় ছড়ান ভুলে-যাওয়া সেই সভ্যতার বাহনেরাই হয়ত তাদের প্রথম দীক্ষাগুরু! কে জানে? সাঁওতাল মেয়েরা দূরের কমল দ' থেকে জল নিয়ে আসছে। জলের কলসি তাদের মাথায় যেন ভার নয়, সুঠাম শরীরের একটা শোভন অলঙ্কার। জল তাদেরও দরকার, কিন্তু তাই বলে কেঁচোর মত নরম মাটি খুঁজে তারা আস্তানা গাড়ে না। জীবন-যাত্রা সম্বন্ধে একটি সহজাত শুভবুদ্ধি তাদের আছে। তারা গ্রাম থেকে শুকনো উঁচু ডাঙা দেখে বাসা বাঁধে। মাটি আঁচড়ে জল পাবার জন্যে তারা ব্যাকুল নয়।

প্রথম প্রথম অমলের গ্রামের লোকের উপর রাগ হয়েছে। এখনও তারা এই মৃত্যুবীজ-আকীর্ণ ধসে-যাওয়া গ্রাম ছেড়ে সুষনোডাঙায় নতুন করে গ্রামের পত্তন ত করতে পারে! সেখানে অবাধ আলো বাতাস। পচা ডোবার নিশ্বাসে আকাশ সেখানে বিষাক্ত হয়ে উঠবে না। কিন্তু অমল আজকাল বোঝে, গ্রামের লোকেরা কত নিরুপায়। এই আগাছার জঙ্গল, এই পচা ডোবা, নোনাধরা ইটের এই ধ্বংসস্তূপের সঙ্গে তাদের জীবন অচ্ছেদ্য ভাবে মরণ-শৃঙ্খলে জড়ান। সে-শৃঙ্খল তারা ছিঁড়তে পারবে না কোন দিন।

বাঁয়ে এবার শীতল-বাঁধের দক্ষিণ পাড়টা দেখা যাচ্ছে। বিরাট

উঁচু লাল মাটির সুদীর্ঘ স্তূপ। যুগযুগান্তের রোদ আর বৃষ্টিধারা তার উপর স্থাপত্য চালিয়েছে। বিচিত্র এলোমেলো ছাঁদ ও খাদ! কাঁটা-ঝোপ জন্মেছে এখানে সেখানে। কালের স্পর্শে মানুষের হাতের ছাপ গিয়েছে মুছে। দূর থেকে দেখলে মনে হয় যেন লম্বা পাথুরে ঢিবি, ছোটখাট পাহাড়ের ভূমিকা।

মোহিত হঠাৎ বেশ একটু উত্তেজনার সঙ্গে অমলের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করে বলে, "ওই দেখ, সেই মেয়েটা।"

অমলের চোখেও তখন পড়েছে। বাঁধের পাড় যেখানে পশ্চিমে ঘুরে গিয়েছে সেখানে একটি ঢিবির ওপর মেয়েটি দাঁড়িয়ে। মুখ ভাল করে এত দূর থেকে দেখা যায় না, কিন্তু দেহের দীর্ঘ সুঠাম গড়নটি খুব বাঙালী-সুলভ নয়।

এই গ্রামের পক্ষে দৃশ্যটা এমন বিস্ময়কর যে, গোড়াতে কোন কিছু জিজ্ঞাসা করবার কথাই অমলের মনে হয়নি। মেয়েটিকে ঢালু পাড়ের ওপর দিয়ে সন্তর্পণে নেমে আসতে দেখে, অমল জিজ্ঞাসা করে, "সেই মেয়েটি মানে? কে ও?"

"বাঃ, ওই ত সেই বুড়োর মেয়ে—সামন্তদের সেই ভুতুড়ে ভিটেতে থাকে। জান অমল দা, মেয়েটার ভয়ডর লজ্জা-সরম নেই। যখন তখন একা একা সুষনোডাঙায় ঘুরে বেড়ায়।"

মেয়েটি আজ কিন্তু একা আসেনি দেখা যায়। একটু দূরে বাঁধের পাড়ের একটা সহজ নামবার জায়গা দিয়ে প্রৌঢ় এক ভদ্রলোক নেমে আসছেন। মেয়েটি তাঁরই জন্যে অপেক্ষা করে দাঁড়িয়ে আছে। প্রৌঢ় ভদ্রলোকের একটা হাত ব্যাণ্ডেজ করে কাঁধে বাঁধা স্লিংএ ঝোলান। অমল বুঝতে পারে কাল হঠাৎ এই হাত ভাঙার দরুনই নিশ্চয় রাত্রে কুমুদ ডাক্তারের ডাক পড়েছিল। যাক, কিছু গুরুতর ব্যাপার তাহলে নয়। কিন্তু বুড়োর সখ ত খুব! হাত ভাঙা অবস্থাতেও সকালে শীতল-বাঁধে বেড়াতে

এসেছে, তাও আবার বাঁধের পাড় বেয়ে ভিতরে ঢুকে! কী আছে এমন সেখানে দেখবার? সব শুকিয়ে শুধু মাঝখানে একটু জলার মত হয়ে আছে মাত্র। ভুবন বারুই তার আশে পাশে হেলায়-ছেদ্দায় দুটো ধান বোনে ফি বছর।

প্রৌঢ় ভদ্রলোক এবং মেয়েটি তাদের পাশ দিয়েই চলে যায়। প্রৌঢ়ের শুকনো পাকানো চেহারা। বয়সের অনুপাতে সামর্থ্য কিন্তু অটুট আছে বলেই মনে হয়।

মেয়েটির সত্যিই লজ্জা সরম নেই। অসঙ্কোচে সে অমলকে বেশ ভাল ভাবেই পর্যবেক্ষণ করতে করতে যায়। লজ্জায় প্রথম চোখ নামাতে হয় অমলকেই। কিন্তু মোহিতকে দেখে মেয়েটি ও প্রৌঢ় দুজনেই একটু হাসে। মেয়েটি বলে, "আর যে আমাদের বাড়ি যাও না—"

মোহিত অত্যন্ত অপ্রস্তুত ভাবে বলে, "যাব একদিন।"

তারা একটু দূরে চলে গেলে অমল আর না জিজ্ঞাসা করে পারে না, "তোমায় ত ওরা চেনে দেখছি!"

অত্যন্ত লজ্জিত ভাবে মোহিত বলে, "হ্যাঁ, একদিন গেছলাম ওদের বাড়ি।" নিজের লজ্জটা কাটাবার জন্যেই মোহিত আবার বলে, "জান অমলদা, মেয়েটার কী অদ্ভুত নাম—থিয়া। থিয়া আবার নাম হয় নাকি!"

থিয়া নামটা অদ্ভুত বটে। মেয়েটিও ত সাধারণ নয়। তার চোখের ভুরুতে অচেনা বিদেশী টান, বিদেশী টান তার কথায়।

মোহিত তাদের বাড়ি গিয়েছে। এ-গাঁয়ে মোহিতের অজানা কিছু থাকবার জো নেই। অমলের আরও অনেক কিছু জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু করে না।

আজ আবার সিধু খুড়োর সঙ্গে খানিক দূরেই দেখা। মাঠের মাঝে একটা ভাঙা শিবমন্দিরের চৌচির ভিতটা শুধু দাঁড়িয়ে

আছে। চারিদিকে বোয়ান ঝোপের মাঝে টুকরো-টাকরা পাথর ছড়ানো। সিধুখুড়ো সেখানে বসে আপন মনে কী বকছে।

"এখানে বসে যে সিধুখুড়ো ?" মোহিত জিজ্ঞাস করে।

"তাঁতীঘর খুঁজতে এসেছিলাম রে, তাঁতীঘর! কাপড়টা বড় ছিঁড়ে গেছে কিনা। একটা কাপড় চাই।" সিধুখুড়ো আবার অন্যমনস্ক হয়ে যায়।

পথে যেতে যেতে মোহিত বলে, "সিধুখুড়ো ভুল কিছু বলেনি অমলদা। জান ত এখানে পঞ্চাশ বছর আগেও অমন বিশ ত্রিশ ঘর তাঁতী, বিশ ত্রিশ ঘর তেলী ছিল। এখন দেখছ শুকনো বাঁজা ডাঙা, তখনও পর্যন্ত কিন্তু শীতল-বাঁধের জলে এখানে সোনা ফলত। শীতল বাঁধও শুকিয়েছে, তারাও কোথায় উজাড় হয়ে গেছে···সিধু-খুড়োর বয়সের সত্যি গাছ-পাথর নেই—এখানে সে তাঁতীঘর দেখেছে, সে কবেকার কথা।"

মোহিত আরও অনেক কিছু বলে চলে। কিন্তু অমলের কানে যায় কিনা সন্দেহ। অনেকক্ষণ থেকে সে অন্য কিছু একটা ভাবছে।

রাত-পাহারার দলটা ভেঙে গেল। প্রভাত কদিনের জন্য কলকাতা গিয়েছিল। ফিরে এসে একদিন বলল, "না রাত-পাহারায় আর কাজ নেই। ও তুলে দাও।"

তাই হল। রাত-পাহারার বদলে সন্ধ্যে-সকাল চৌধুরী-বাড়ির বৈঠক-খানায় আজকাল আড্ডা বসে।

এক রকম ভালই হয়েছে। শীতের রাত্রে টহল দিয়ে বেড়াতে আর কদিন ভাল লাগে ? তবে—একটু কথা আছে। ব্যাপারটার আরম্ভ কী থেকে তা অনেকেই জানে, কিন্তু শেষটা সবাই অন্য রকম আশা করেছিল। চৌধুরী-বাড়ির ছেলে হয়ে প্রভাত ভুবন

বারুইএর কাছে হার মেনে পিছিয়ে যাবে, এটা কেউ আশা করেনি।

ভুবন বারুই ও তারই মত আরও জন কয়েককে কদিন ধরে রাত-পাহারায় দেখা যাচ্ছিল না। খবর পাঠালেও তারা দেখা করে না। দেখা করে, গিয়ে বলে এলেও, গায়ে মাখে না। জরিমানার ভয়েও না।

সবাই প্রভাতের জন্যই অপেক্ষা করেছে তারপর। রাত-পাহারার মতলব তারই মাথা থেকে বেরিয়েছে। সে-ই গাঁয়ের ইতর ভদ্র সব ঘর থেকে জোয়ান ছেলেদের একত্র করে এই দলটি গড়েছিল। দিনকাল খারাপ, নিজেদের ধন মান প্রাণ নিজেরাই সামলাবার জন্যে তৈরী হতে হবে, এই কথাই সে সকলকে বুঝিয়েছে। গোড়ার দিকে সকলের কাছে সাড়াও পাওয়া গিয়েছে ভাল। খানিকটা লজ্জা, খানিকটা চৌধুরী-বাড়ির সম্মান, আর বাকীটা জলখাবারের ঢালাও ব্যবস্থায় কারও এ-ব্যাপারে উৎসাহের অভাব দেখা যায়নি। তারপর প্রভাত কদিনের জন্যে গিয়েছিল কলকাতায় ফিরে। তখন থেকেই ভাঙন শুরু। প্রথমে ভুবন বারুই একাই কামাই করলে একদিন। তারপর মাঝি ও তেলীদের যে-কয়জন দলে নাম লিখিয়েছিল, একে একে বিশু লোহার ছাড়া সবাই খসে পড়ল। ভুবন বারুই-ই নাকি শোনা গেল তাদের পাণ্ডা। সে-ই নাকি তাদের বুঝিয়েছে যে, বাবুদের সঙ্গে অত দহরম-মহরম ভাল নয়। বাবুদের প্রাণে শখ আছে তারা রাত জেগে গাঁয়ে টহল দিয়ে বেড়াক, গরিব ছোটলোকের ছেলেদের তা পোষায় না, ভালও দেখায় না।

প্রভাত ফিরে এসে সব শোনে। বিভূতির সব বিষয়েই টেক্কা দেওয়া চাই। বললে, "নেহাত তোমার জন্যেই অপেক্ষা করে

আছি, নইলে দুদিনে সিধে করে দিতে পারতাম। তখনই তোমায় বলেছিলাম, ওদের অত আস্কারা দিও না—ওরা কি সেই মাল, লাথির ঢেঁকি কি চড়ে ওঠে!"

প্রভাত এক এক করে সবাইকে ডেকে পাঠালে। ভুবন বারুই ছাড়া সবাই এসে হেঁট মাথায় দেখা করে গেল। তাদের সবার কথাতেই বোঝা গেল রাত-পাহারার জন্যে বিশেষ করে ছোটবাবুর কথায় তারা জান দিতে প্রস্তুত। তবে পঞ্চু তেলীর কদিন ধরে জ্বর আসছে রাত্রে, লক্ষ্মণ মাঝি গিয়েছিল তার কুটুম বাড়ি, হাবু মাঝির ছোট ছেলেটা যায় যায়······ অর্থাৎ সবারই কামাই করবার একটা না একটা গুরুতর কারণ আছে।

প্রভাত সব শুনে কিছু না বলেই তাদের বিদেয় করে দিল। বিশু লোহার বললে, "সব মিছে কথা ছোটবাবু, আপনি কিছু বলেন না, তাই তো ওরাও তো পায়। বড় বাবুর কাছেই ওরা চিট্ থাকে।"

প্রভাত একটু হেসে বললে, "তবে তুই আসিস কেন বলতে পারিস!"

"আজ্ঞে, আমার কথা আলাদা; আমি ত আর নেমকহারাম নই ওদের মত। সাতপুরুষ আপনাদের খেয়ে মানুষ, আপনাদের সঙ্গে বেইমানি করলে ধর্মে সইবে!"

প্রভাত খুশী হল কিনা বলা যায় না। অমলকে সঙ্গে নিয়ে পরের দিন সে ভুবন বারুইএর বাড়ি নিজেই গেল।

গাঁয়ের এক প্রান্তে ভুবন বারুইএর ঘর। অত্যন্ত নিচু একটা কুঁড়ে, পাশে একটা খোলা চালায় ঢেঁকিশাল। ছোট উঠনটায় দুটো ছাগল বাঁধা। গোটা তিনেক হাঁস তাদের আসতে দেখে উচ্চৈঃস্বরে ডাকতে ডাকতে পাশের জলায় গিয়ে নামল। সেখানে

নিচু জমিতে বর্ষার জল এখনও শুকয়নি। নোংরা উঠোনের মাঝখানে একটা বছর খানেকের হাড়-পাঁজরা-বেরুন লিকলিকে পেট-মোটা ছেলে মাটির ওপরই রোদ্দুরে উপুড় হয়ে শুয়ে আপন মনে খেলা করছে। তার মাথা ও পিঠ ঢেকে একটা ছোট কাপড়ের টুকরো দোলাইএর মত করে বাঁধা। তা ছাড়া গায়ে আর তার কিছু নেই। ভুবন আর তার বৌ উঠনের এক ধারে প্রকাণ্ড এক তাল মাটি তৈরী করছিল ঘরের দেওয়াল সারতে। ভুবনের বৌ তাদের দেখে এক হাত ঘোমটা দিয়ে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। ভুবন একেবারে তটস্থ হয়ে উঠে এল কাদা মাখা হাতে। ছোটবাবু নিজে তার বাড়িতে আসবেন, এ তার কল্পনার বাইরে। কী করবে, সে ভেবেই পায় না।

"কী লজ্জার কথা, আপনি নিজে কেন এলেন ছোটবাবু। আমি ত আজই যাচ্ছিলাম।"

প্রভাত হেসে বললে, "তাতে আর কী হয়েছে। কিন্তু তোর ব্যাপারটা কী বলত!"

ভুবন তখন ছোটবাবুর খাতির করতেই ব্যস্ত। তাড়াতাড়ি হাত ধুয়ে নিচু দাওয়ার উপর ঘর থেকে একটা তালপাতার চাটাই এনে পেতে দিয়ে বললে, "দেখুন ত! আপনাদের কী করে এতে বসতে বলি!"

ছেলেটা তখন নতুন লোক দেখেই বোধ হয় কাঁদতে শুরু করেছে। বৌকে ধমক দিয়ে বললে, "যা, নিয়ে যা এখান থেকে!"

প্রভাত ও অমল চাটাইএর উপর বসবার আগে গামছা দিয়ে চাটাইটা বার কয়েক ঝেড়ে, অকারণ খানিকটা ধুলো উড়িয়ে সে

অত্যন্ত কুণ্ঠিতভাবে জানাল, গরিবের টুল চৌকি ত নেই, ছোটবাবুর এখানে বসতে কত কষ্ট হবে।

প্রভাত সরাসরি আসল কথাটাই আবার পাড়লে, "তুই কি রাত-পাহারায় আর যাবি না ভুবন?"

অত্যন্ত সঙ্কুচিত ভাবে মাথা চুলকে ভুবন বললে, "আজ্ঞে যাব না কেন? তবে কি না··· ··"

"তবে কী?"

"আজ্ঞে, ওরা সব কী যে বলছে!"

"কী বলছে? কারা বলছে—বল?"

ভুবন এবার যেন সাহস করে বলেই ফেললে কথাটা, "আজ্ঞে সবাই বলছে, রাত-পাহারার দলে নাম লেখালে যুদ্ধে যেতে হবে!"

"যুদ্ধে যেতে হবে!" অমল ও প্রভাত দুজনেই এবার না হেসে পারলে না। "যুদ্ধে যেতে হবে কী রে?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, পুলিশে নাকি সব নাম লিখে নিয়ে যাচ্ছে, দরকার হলেই যেখানে খুশি চালান করে দেবে। ওদের এখন অনেক লোক দরকার কিনা!"

এবার তারা হাসতে পারলে না। খানিক গম্ভীরভাবে চুপ করে থেকে প্রভাত বললে, "তোদের কি আমাদের ওপর কিছু বিশ্বাস নেই ভুবন? যুদ্ধে যাবার ব্যাপার হলে তোদের কাছে আমি কথাটা লুকিয়ে রাখতাম!"

"আজ্ঞে না বাবু, তা কি আমরা জানি না।" ভুবন একেবারে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল, "আমি ত সেই কথাই ওদের বলি। বলি, ছোটবাবু কি তেমনি মানুষ রে, যে ফাঁকি দিয়ে আমাদের যুদ্ধে পাঠাবে। তবু ওরা বলে কী জানেন?"

"কী বলে আবার?" অমলই জিজ্ঞাসা করলে একটু রেগে।

প্রভাত বললে, "স্পষ্ট করেই কথাটা বলে ফেল ভুবন!"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, বলব বৈকি! আপনার কাছে বলব না ত কার কাছে বলব। ওরা বলে যে, বাবুদের শখ হয়েছে, পাহারা দিয়ে বেড়াক, সারাদিন গতর খাটিয়ে আমাদের মিনিমাগনা আবার রাত জেগে টহল দেওয়া কি পোষায়। তা ছাড়া, আমাদের কীই বা কার আছে যে, পাহারা দিয়ে আগলাতে হবে।"

কথাটা বলে ফেলে ভুবন অত্যন্ত লজ্জিত ভাবে মুখ কাঁচুমাচু করে রইল।

অমল একটু রেগেই জিজ্ঞাসা করতে গেল, " 'ওরা, ওরা' বলছিস 'ওরা' কারা বল ত?"

প্রভাত কিন্তু সে-কথার উত্তরের জন্যে অপেক্ষা করল না। অত্যন্ত গম্ভীরমুখে অমলকে নিয়ে সে উঠে গেল।

ভুবন পিছন থেকে বললে, "আমার কোন অপরাধ নেবেন না বাবু! আপনি হুকুম করলে আমি আজই গিয়ে হাজিরে দেব।"

প্রভাত সে-কথার কোন উত্তর দিলে না।

সবাই তারপর আশা করেছিল প্রভাত এর একটা বিহিত করবেই। কদিন ধরে তাকে যে-রকম চিন্তিত দেখা গিয়েছে তাতে সবাই ভেবেছে একটা কিছু মতলব সে নিশ্চয়ই ভাঁজছে। বলতে গেলে, এটা একরকম চৌধুরীবাড়ির অপমান। প্রভাত যত ভালমানুষই হক এ-অপমান গায়ে পেতে নেবে না।

কিন্তু সবাইকে অবাক করে প্রভাত একদিন দল ভেঙে দেওয়ার সঙ্কল্প জানিয়েছে। অনেকে আপত্তি জানিয়েছে। বিভূতি অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে উঠেছে, "ছোটলোকের আস্পর্দ্ধার তাহলে আর সীমা থাকবে না। বাবুদের এর পর তারা আর তোয়াক্কা করবে?" প্রভাত কারও কথার প্রতিবাদ করেনি, কিন্তু মতও তার বদলায়নি।

প্রভাত সাধারণত কথা বলে অত্যন্ত কম। এ-ব্যাপার নিয়ে শুধু একটি মন্তব্য তার মুখে একদিন শোনা গিয়েছে। অমল বুঝি রাত-পাহারার দল সম্বন্ধে কী বলতে গিয়েছিল। প্রভাত গম্ভীর মুখে বলেছিল, "অষ্ট ধাতু যে-আগুনে গলে মিশে যায়, খড়ের নুড়ো জ্বালিয়ে তা হয় না। আমার সেইখানেই ভুল হয়েছিল!"

অমল এ-সম্বন্ধে আর কোন কথা কোন দিন বলেনি। প্রভাতের সঙ্গে অনেক বিষয়েই তার গরমিল কিন্তু তবুও প্রভাতের জন্যে তার মনে খুব উঁচু একটি আসন পাতা আছে। এই একটি মাত্র লোকের কাছে নিজেকে ছোট বলে স্বীকার করতে তার লজ্জা নেই। প্রভাত, চৌধুরীবাড়ির তিন ভাইয়ের সবচেয়ে ছোট এবং সকল দিক দিয়ে সে বাড়ি-ছাড়া। চৌধুরীদের জমিদার হিসাবে বদ্‌নাম নেই। তারা বিষয়বুদ্ধিতে পাকা, নরম-গরম কী-ভাবে মিশিয়ে সংসারে চলতে হয় তারা জানে। বিশেষ করে বড় ভাই প্রকাশ চৌধুরী—যিনি আজকাল চৌধুরীদের বিষয়-আশয় নিজে দেখেন, গরিবের মা-বাপ বলে তাঁর একটা সুখ্যাতিই আছে। দান-ধ্যান তাঁর যথেষ্ট, নিজেদের খরচায় গাঁয়ে একটা বাংলা স্কুল তিনি বসিয়েছেন। বৎসরে বার কয়েক পুজোয় পার্বণে আশেপাশের অনাথ আতুর কাঙালীরা শ্যামসুন্দরের মন্দিরের প্রাঙ্গণে পেট ভরে ভাল মন্দ খেয়ে চৌধুরীদের জয় গান করে যায়। মেজ ভাই প্রতাপ চৌধুরী বিলেত থেকে ব্যারিস্টারি পাশ করে এসে কলকাতাতে প্র্যাক্‌টিস করেন, গাঁয়ে ক্বচিৎ-কদাচিৎ উৎসবে অনুষ্ঠানে তাঁকে আসতে দেখা যায়। কিন্তু বিলেত-ফেরত হয়েও তাঁর এতটুকু সাহেবি নেই, না বেশভূষায়, না চালচলনে। গাঁয়ের লোক তাঁর অমায়িক ব্যবহারে মুগ্ধ। দেশের বাড়িতে এসে তিনি আত্মীয়-স্বজন, জ্ঞাত-গোত্র সকলের খোঁজ নেন, নিজে থেকে আগে সকলের বাড়িতে গিয়ে দেখা করেন। অদ্ভুত তাঁর স্মরণশক্তি,

আশ্চর্য তাঁর সকলের উপর টান। হয়ত রবিদের বাড়ি গিয়েছেন। তারা আসন পেতে দেওয়ার আগেই দাওয়ার উপর ধুলোয় বসে পড়েন। বাড়ির সকলেই তখন শশব্যস্ত। বড়রা চেয়ার এগিয়ে দিয়ে কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। ছেলেমেয়েগুলো একদিকে জড় হয়ে হয়ত সসম্ভ্রমে তাঁকে দেখছে, পাতলা ছিপছিপে শ্যামবর্ণ একটি ফ্রকপরা মেয়েকে তার মধ্যে ডেকে আদর করে তিনি বলেন, "বল দেখি ভেলি, এবার আমায় পছন্দ হচ্ছে ত! ভাল করে দেখ। বয়সটা আমার সব এবার কলকাতায় ছাঁটিয়ে এসেছি! চুলগুলো সব কলি-ফেরান।" ভেলি এখন একটু বড় হয়েছে। ঠাট্টার মানে বোঝে! লজ্জায় এতটুকু হয়ে পালাতে পারলে সে বাঁচে। সকলের মধ্যে হাসির ধুম পড়ে যায়। বাবা! মেজবাবুর এতও মনে থাকে! ভেলি, রবির ভাগ্নী, সম্পর্কে মেজবাবুর নাতনী। বছর দুই আগে এমনি এ-বাড়িতে বেড়াতে এসে তাকে হাত-পা ছুঁড়ে বায়না করে কাঁদতে দেখে তিনি ঠাট্টা করে বলেছিলেন, "কাঁদিসনি কাঁদিসনি, তোকে বিয়ে করে নিয়ে যাব, দেখ না।" ভেলি তখন ছ সাত বছরের মেয়ে। রাগের মাথায় বলেছিল, "তোমায় বিয়ে করতে বয়ে গেছে,—তুমি ত বুড়ো।" মেজবাবু হেসে বলেছিলেন, "বটে! আচ্ছা দাঁড়া, এবার কলকাতায় কী রকম বয়স ভাঁড়িয়ে আসি দেখবি।" ছ বছর বাদেও সে-কথা মেজবাবুর মনে আছে—ভেলির নামটা পর্যন্ত!

শুধু কি ভেলি, মেজবাবুর সকলের কথা মনে থাকে, সকলের নাড়ী-নক্ষত্রের খবর। প্রত্যেক বার ফিরে যাবার সময় তিনি দুঃখ করে যান—নেহাত পেশার দায় তাই, নইলে দেশ ছেড়ে সেই কলকাতা থাকতে কি ভাল লাগে।

প্রভাত ভায়েদের থেকে একেবারে আলাদা। মেজ ভায়ের মত মিশুক সে নয়, মানুষকে সহজে আপনার করার কোন কৌশল সে

জানে না, আবার বড় ভাইয়ের মত স্বাভাবিক দুর্লজ্ঘ্যতাও তার চারিপাশে নেই। আর দু ভাই জীবনে ভিন্ন ভিন্ন পথ বেছে নিলেও সুনির্দিষ্ট একটি ধারা অনুসরণ করে এসেছেন। তাঁরা বংশের প্রাচীন গৌরবের কথা ভোলেননি, আধুনিক কালের দাবিকেও অস্বীকার করেননি। পৃথিবীতে তাঁদের জায়গা যে কোথায় এবং তাঁদের সার্থকতা যে কিসে, তা তাঁরা ভাল করেই জানেন। সবসুদ্ধ জড়িয়ে তাঁদের চরিত্র ও জীবনের তাই একটি স্পষ্ট রূপ আছে। কিন্তু প্রভাত যেন এখনও হাতড়ে ফিরছে। মত ও পথ কিছুই যে সে বাছাই করে উঠতে পারছে না। তার এই হাতড়ে বেড়ানর আন্তরিকতাই অমলকে সবচেয়ে মুগ্ধ করে। তার নিজের ভিতরেও হয়ত এমনি একটি অনিশ্চয়তার দ্বন্দ্ব আছে। তবে প্রভাতের মত সে-দ্বন্দ্ব এত তীব্র, তার প্রকাশ এমন উগ্র নয়। প্রভাত এ-পর্যন্ত অনেক কিছু করেছে এবং যখন করেছে তখন চরম ভাবেই করেছে। সে খদ্দর পরেছে, জেলে গিয়েছে, লাঠি খেয়েছে, তারপর সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে দিনকতক শুধু পড়াশুনায় মন দিয়েছে। কিন্তু কলেজের পড়া বেশী দিন সে করতে পায়নি। আবার নতুন এক প্রেরণা নিয়ে নতুন এক আন্দোলনে নেমে ফ্যাক্টরিতে, কারখানায়, মজুরদের বস্তিতে বস্তিতে বক্তৃতা দিয়ে বেড়িয়েছে, যথারীতি মার খেয়েছে ও জেলে গিয়েছে। এবারে জেল থেকে ফিরে, সে কিন্তু বদলে গিয়েছে আবার। তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ অনেকদূর এগিয়েছে। প্রভাত কোন আন্দোলনে আর যোগ দেয়নি। সুবোধ ছেলের মত গ্রামে ফিরে গিয়েছে। কিছু দিন আগে সে বাড়ি থেকে টাকা নেওয়া বন্ধ করেছিল। জমিদারির এক কপর্দক সে স্পর্শ করবে না, এই ছিল নাকি তার সঙ্কল্প। এবার দেখা গিয়েছে সে-সব পাগলামি তার নেই। দাদারা নিশ্চিন্ত হয়েছেন। তাঁরা বুঝেছেন, রোগ প্রায় কেটে গিয়েছে।

রাত-পাহারার দল গড়ার মত একটু আধটু উপসর্গকে তাই বড়বাবু প্রকাশ চৌধুরী প্রশ্রয়ই দিয়েছেন। রাত-পাহারার দল প্রভাত নিজেই ভেঙে দিতে তিনি নিশ্চয়ই মনে মনে হেসেছেন। মাঠ বন ভেঙে সবাইকে একদিন বাঁধা রাস্তা ধরতে হয়।

কিন্তু সত্যি কি প্রভাত চৌধুরী এবার বাঁধা রাস্তায় পা বাড়াচ্ছে! আঁকা বাঁকা নানা রাস্তা খুঁজে সে কি শেষ পর্যন্ত চৌধুরীদের ধারাতেই গিয়ে মিশবে ?

প্রভাত আজকাল শুধু অমলকে সঙ্গে নিয়ে এক একদিন বেড়াতে বার হয়। সেদিন শীতল-বাঁধের কাছে গিয়ে সে আর যেতে চায়নি। বাঁধের পাড়ের উপর অনেকক্ষণ চুপ করে এক জায়গায় বসে থেকে উঠে আসবার সময় হঠাৎ বলেছিল, "দেড় শ বছর ধরে এই শীতল-বাঁধ মজে গিয়েছে। এ-বাঁধের ওপর তাদের কী দাবি ছিল গাঁয়ের লোকের মনেও নেই।" খানিক বাদে সে আবার বলেছে, "নতুন ওষুধ যে চালাতে চায়, নিজের উপর পরীক্ষা করবার সাহস তার আগে চাই!"

অমল প্রভাতের কথার সূত্র ঠিক ধরতে পারেনি, কিন্তু জিজ্ঞাসাও করেনি। ফিরবার পথে সেদিনই বুঝি আবার থিয়া আর তার বাবার সঙ্গে দেখা! নরেশ্বর বাবু দাঁড়িয়ে পড়ে বলেছিলেন, "এ কদিন তোমায় দেখিনি ত অমল, এখানে ছিলে না নাকি!"

থিয়া হেসে বলেছিল, "ছিলেন নিশ্চয়, তবে বোধ হয় সাপের ভয়ে যাননি।"

হ্যাঁ, থিয়াদের সঙ্গে অমলের ইতিমধ্যে আলাপ হয়েছে। সেখানে যাতায়াতও করেছে মাঝে মাঝে। আরও অনেকেই যায় আজকাল। চৌধুরী-বাড়ির আড্ডাটাই ক্রমশ যেন ভেঙে যাচ্ছে। সামন্ত-ভিটের চালচলন নিয়ে গাঁয়ে অবশ্য বেশ একটু আন্দোলন

শুরু হয়েছে, নরেশ্বর বাবুর ইতিহাস কিছু কিছু আজকাল সবাই জানে। দু পুরুষ তাঁরা নাকি বর্মায় কাটিয়েছেন, যুদ্ধের জন্য শেষে বাধ্য হয়েছেন পালিয়ে আসতে। পুরোপুরি বাঙালীও নাকি তাঁরা নন। থিয়ার মা অন্তত বাঙালী ছিলেন না। মেয়েটাও তাই নাকি অমনি বেয়াড়া বেহায়া, গাঁয়ের ছেলেগুলোর মাথা চিবিয়ে খাচ্ছে। এই হল গাঁয়ের ধারণা। নিজেদের মাথা বাঁচাবার কোন ব্যাকুলতা কিন্তু ছেলেদের দেখা যায় না। তারা প্রায় সবাই নানা ছুতোয় সেখানে যায়। অমলও গিয়েছে কয়েক বার।

অবশ্য সাপের ভয়ে সেখানে যাওয়া সে বন্ধ করেনি। একদিন আর একটু হলে একটা খরিশের ঘাড়ে পা দিয়েছিল বটে। সেদিন গল্প করতে করতে একটু রাত হয়ে গিয়েছিল, পোড়ো ভিটের পাশ দিয়ে বড় রাস্তায় যাবার পথটা থিয়াই আলো দেখিয়ে এগিয়ে দিতে এসেছিল। অমল একটু সামনে ছিল, থিয়া আলো নিয়ে পিছনে। হঠাৎ থিয়া পিছন থেকে জামা ধরে তাকে সজোরে টেনে চিৎকার করে উঠেছিল, "সাপ সাপ!"

বেশ বড় একটা খরিশ। একটা পা বাড়ালেই আর বোধ হয় রক্ষা ছিল না। সাপটা রাস্তা পার হয়ে যাচ্ছিল বোধহয়। আলো দেখে সে স্থির হয়ে গেল।

কয়েকটা উদ্বিগ্ন মুহূর্ত! থিয়া তাকে সভয়ে জড়িয়ে আছে। কঠিন বাহুবেষ্টনে দ্রুত নিশ্বাস-পতনে থিয়ার বুকের ওঠানামা অমল টের পাচ্ছিল, তার সঙ্গে হৃৎপিণ্ডের সবল হাতুড়ি পেটার শব্দ; কিন্তু সেটা তার, না থিয়ার, আলাদা করে বোঝা যায় না।

খানিকটা স্থির হয়ে থেকে সাপটা আবার ধীরে ধীরে পোড়ো ভিটের জঙ্গলের ভিতরে চলে গিয়েছিল।

থিয়ার চিৎকারে নরেশ্বর রোয়াকে এসে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "কী হয়েছে, কী!"

অমলকে ছেড়ে দিয়ে থিয়া উত্তেজিত ভাবে বর্মী ভাষাতেই বুঝি কী বলেছিল। নরেশ্বর হেসে বলেছিলেন, "যাক, চলে গিয়েছে ত, আর ভয় নেই! বাধা পড়েছে যখন তখন আর একটু বসে যাও অমল।"

অমল আপত্তি করেনি, ফিরে এসে বলেছিল, "এরকম জায়গায় বাস করা আপনাদের উচিত নয়। কত কালের পুরনো পোড়ো বাড়ি, এ ত সাপখোপেরই রাজত্ব—পদে পদে এখানে বিপদ হতে পারে।"

ঠাট্টা করে তারপর বলেছিল, "তাছাড়া নরহরি সামন্তর ওপর সাপেদের আক্রোশ ত আছে!"

অকস্মাৎ নরেশ্বরের মুখের চেহারা অদ্ভুত ভাবে বদলে গিয়েছে, গলার স্বর অত্যন্ত কঠিন রুক্ষ হয়ে উঠেছে, "নরহরির কথা তুমি কী জান?"

কেন যে এই নিরীহ ভালমানুষের বদমেজাজী বলে প্রথম দুর্নাম রটেছিল, অমল যেন বুঝতে পেরেছে। নরেশ্বর কিন্তু পরমুহূর্তেই সামলে নিয়ে হেসে বলেছেন, "নরহরির বড়ি থাকতে আমাদের সাপের ভয় কী?"

"নরহরির বড়ির কথা আপনিও শুনেছেন দেখছি!" অমল একটু আশ্চর্য হয়ে বলেছে, "কিন্তু জানেন ত, সাপুড়ে ওঝারা যা দেখায় সব বুজরুকি! সাপের বিষের সত্যি কোন ওষুধ নেই।"

থিয়া হঠাৎ হেসে ফেলেছে, অমল অবাক হয়ে তার দিকে চাইতে হাসি থামিয়ে বলেছে। "সাপে কামড়ান ভাল নয়, মাঝে মাঝে সাপ দেখা কিন্তু ভাল!"

অমল তারপর যাবার জন্যে উঠে পড়েছে। নরেশ্বর বলেছেন, "খাতাটা কিন্তু আর একদিন মনে করে এন ঠিক।"

নরেশ্বরের এখানে এসে এক বাতিক হয়েছে, সামনবেড়ের যত

প্রাচীন পরিবারের ইতিহাস সংগ্রহ করা। অমলরা চৌধুরীদের দৌহিত্র-বংশ। অমলের প্রপিতামহ ব্রজবিনোদ রায় চৌধুরী-বাড়ীর প্রথম বৈষ্ণব রামদয়াল চৌধুরীর একমাত্র মেয়ের ছেলে। তিনি মাতামহের যা বিষয় পেয়েছিলেন, নিজের চেষ্টায় ও কৃতিত্বে তা বহুগুণ বাড়িয়ে শেষ পর্যন্ত চৌধুরীদেরও নাকি টেক্কা দেবার উপক্রম করেছিলেন। মাতুলদের সঙ্গে দাঙ্গা-হাঙ্গামা পর্যন্ত তাঁর চলেছিল। কোম্পানির আমলে তিনি এ-অঞ্চলের প্রথম দারোগা হন। অত্যন্ত দুর্দান্ত ছিলেন বলে লোকে তাঁর নাম দিয়েছিল বাঘা বক্সী। কিন্তু শারীরিক বল ও সাহস ছাড়াও তাঁর অনেক গুণ ছিল। তখনকার দিনে তিনি একটি খাতায় প্রতিদিনের খবর লিখে রাখতেন। গাঁয়ের বড় বড় ঘরের কুলজিও তিনি নাকি তৈরী করেছিলেন। অমল প্রাচীন একটা সিন্দুক ঘাঁটতে ঘাঁটতে একদিন সেই রোজনামচা ও কুলজির দুটো ছেঁড়া পাতা পেয়েছিল। নরেশ্বরের কাছে একদিন সে-কথা বলায় তিনি অত্যন্ত আগ্রহভরে সেগুলি চেয়েছেন।

খাতা আনবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে অমল চলে আসছিল। এবারেও থিয়া আলো হাতে তাকে এগিয়ে দিতে গিয়ে হঠাৎ হেসে বলেছিল, "না, আপনার সঙ্গে যেতে সাহস হয় না। আবার যদি সাপ বেরয় !"

তারপর সত্যি সত্যি বার্মী চাকরটাকে ডাকিয়ে সে তাকে আলো নিয়ে এগিয়ে দিয়ে আসতে হুকুম করেছিল।

অমল কয়েক পা যেতে না যেতেই কিন্তু পিছন থেকে ডেকে বলেছিল, "শুনুন !"

অমল ফিরে দাঁড়িয়েছিল অবাক হয়ে।

"আমি ভেবেছিলাম যে-রকম সাপের ভয়, আজ আপনি এখানেই থাকতে চাইবেন।"

থিয়া সোজাসুজি তার মুখের দিকে তাকিয়ে। তার দৃষ্টিতে দুর্বোধ কৌতুকের ঝিলিক। অমল আরক্ত মুখে কিছু না বলেই চলে এসেছিল।

চাতক পাখিদের ডানা অক্লান্ত। ঝাঁকে ঝাঁকে শুধু যেন আকাশ ফেনিয়ে তোলার উল্লাসে ধনুকের মত বাঁকান পাখায় তারা শূন্যে অবিরাম চক্কর দেয় পরস্পরের পিছু পিছু। এ যেন মুক্ত পাখার ছন্দে অপরূপ সন্ধ্যাবন্দনা।

সন্ধ্যার অন্ধকার ক্রমশ আরও গাঢ় হয়ে আসে। চাতক পাখির ঝাঁকও একে একে চৌধুরী-বাড়ির রাসমঞ্চের উপরকার চূড়ার ফোকরে অদৃশ্য হয়ে যায়।

গাঢ় অন্ধকারে এখানে-সেখানে একটা-দুটো জোনাকি যেন রাত্রির হৃদস্পন্দনের মত দপ্‌দপ্‌ করে। কোথায় দূরে, থেকে থেকে বাউরি-পাড়ার ঢোলকের শব্দ। 'কারা-কারা-কারা'—কার হাঁস বুঝি এখনও ঘরে ফেরেনি, সে ডেকে সারা হচ্ছে। সে-সমস্ত শব্দও গাঢ় নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকার ধীরে ধীরে যেন শুষে নেয়। অনেকক্ষণ ধরে ছাদের উপর অনল একা। সুদূর ছায়াপথ থেকে যেন একটা অস্ফুট দীর্ঘশ্বাস খিড়কি-পুকুরের অশথ গাছের পাতাগুলোকে একটু কাঁপিয়ে চলে যায়……

মঞ্জরী আলো নিয়ে উপরে উঠে এসেছে, "তুমি অন্ধকারে ছাদে বসে আছ, আর আমি খুঁজে সারা হচ্ছি। কী ব্যাপার বল ত! খেতে যেতে হবে না ?"

মঞ্জরী আলোটা নামিয়ে রাখে। নামহীন বেদনার বিরাট সীমাহীন রাত্রি ওই আলোয় ঘেরা ছাদটুকুতে আবার সঙ্কুচিত হয়ে আসে।

"চ, যাচ্ছি," বলে অমল উঠে পড়ে। সঙ্কীর্ণ সিঁড়ি দিয়ে মঞ্জরী আগে আগে আলো দেখাতে দেখাতে নামে।

"মাথায় তুই কী তেল মাখিস বল ত ?" অমল জিজ্ঞাসা করে।

"কী আর মাখব, যা যখন পাই।"

"আচ্ছা, এবার একটা ভাল তেল তোকে এনে দেব।" অমল কথা দেয়।

সিধুখুড়ো এক একদিন হঠাৎ চৌধুরী-বাড়ির আড্ডাতে এসে হাজির হয়, বলে, "দে দেখি একটা খবরের কাগজ। যুদ্ধুটার কী হল দেখি ?"

বিভূতি হয়ত হেসে বলে, "যুদ্ধের আর কাগজে কী দেখবে সিধুখুড়ো, চোখেই দেখতে পাবে এবার।"

সিধুখুড়ো অন্যমনস্কভাবে খানিক এক দিকে তাকিয়ে থেকে বলে, "কিন্তু যুদ্ধু আমি করব না।"

সবাই এবার হেসে ওঠে।

"সে কী কথা সিধুখুড়ো। তুমি না যুদ্ধু করলে আমাদের উপায় কী।"

"না, যুদ্ধু আমি কিছুতেই করব না।" সবেগে মাথা নেড়ে সিধুখুড়ো হঠাৎ উঠে চলে যায়। খবরের কাগজের কথা তার মনেই নেই।

সবাই হাসতে থাকে। বাইরে খানিকবাদে যথারীতি সিধুখুড়োর বেসুরো গান শোনা যায়—

যতই খোঁচা দিস না কেন—
কিছুতে করব না লড়াই,
এমন হারা হারব এবার
ভাঙবে তোর ওই জোরের বড়াই।

রবিই বুঝি হেসে বলে, "যাক, সিধুখুড়োর একটা গানের তবু মানে পাওয়া গেল।"

সিধুখুড়োর খুব কম গানেরই কিন্তু মানে পাওয়া যায়। কোন দিন হয়ত সে সন্ধ্যাবেলা অমলদের বারবাড়িতেই একটা শাল-পাতার পাত পেতে নিয়ে বসে। প্রতিদিন কোন না কোন বাড়িতে এমনি পাত পেতে বসা তার দস্তুর। পাতটা সে নিজেই যত্ন করে সুষনোডাঙা থেকে শালপাতা কুড়িয়ে তৈরী করে আনে, কিন্তু মুখ ফুটে কোথাও খাবার কথা বলতে কেউ তাকে শোনেনি। বেশির ভাগ বাড়ি থেকেই তাকে ফিরতে হয় না! অনেকে ভয়ে-ভক্তিতে বেশ একটু যত্ন করেই খাওয়ায়, মঞ্জরী তাদের মধ্যে একজন।

খেতে খেতে সিধুখুড়ো বলে, "একটা নতুন গান বেঁধেছি, শুনবি?

জবাবের অপেক্ষা না করেই সে গান ধরে—

হাত বাড়ালে পাতে ভাত,
পা বাড়ালে রাস্তা,
পিঠ দেখালেই চাবুক দিয়ে
চাপাস চিনির বস্তা।
—কি তোর আজব বিধান!

কুমোর পোকাটা মুখে মাটি নিয়ে জানালার পাল্লা থেকে কড়ি-কাঠ পর্যন্ত চারিদিকে বাসা বাঁধবার জায়গা খুঁজে বেড়াচ্ছে। শীত যায় যায়, তারই খবর এই প্রথম কুমোর পোকার গুঞ্জনে। খিড়কি-পুকুরের অশথ গাছটার শুকনো ঝরা পাতায় ঘরদোর উঠোন ছেয়ে গেল। কটা পাতা ঘুরতে ঘুরতে অমলের ঘরেই এসে পড়ে। শীতের দিন সত্যি ফুরিয়ে এসেছে। সুষনোডাঙা থেকে এখনই

দুপুরে মাঝে মাঝে কেমন একটা উন্মনা দমকা হাওয়া এসে সব কিছু নাড়া দিয়ে যায়।

গাঁয়ে অনেক কিছু হয়ে গিয়েছে এর মধ্যে। মোহিত একদিন পালিয়ে গিয়েছে কলকাতায়। স্যাকরাবাড়ি থেকে মঞ্জরীর চুড়ি কগাছা পালিশ করিয়ে আনতে গিয়ে, আর ফেরেনি। কী বিপদই না হয়েছিল! সেই রাত্রেই মঞ্জরীর বিয়ে। অমলের মা নিজের চুড়ি কগাছা খুলে দিয়েছিলেন। এমন বিয়ের সম্বন্ধটা নইলে ভেঙে যাবে। অমলের মার মন সত্যি অনেক উঁচু।

মঞ্জরীর বিয়েটা হল ভারী আশ্চর্য ভাবে। সকাল বেলাও কেউ কিছু জানে না। মঞ্জরী প্রতিদিনের মত সংসারের সমস্ত কাজকর্ম করেছে, গাই দুয়েছে, ভাঁড়ার বার করেছে, সবাইকে চা-জলখাবার করে খাইয়েছে, সরকারী পুকুরের মাছের ভাগ বুঝে নিয়েছে, হেঁসেলে রান্নায় বসেছে!

কুমুদ ডাক্তারের মেয়ে মমতার সেই দিনই বিয়ে। মমতা মঞ্জরীর ছেলেবেলায় সই। দুপুরে সকলের খাওয়া দাওয়া হলে মঞ্জরী বিয়ের কনেকে দেখতে গিয়েছিল। ঘণ্টা খানেক বাদে নিজেই তাকে বিয়ের কনে হতে হবে, কে জানত!

পাড়াগাঁয়ের বিয়ে। বরপক্ষ আগের দিন রাত্রেই গ্রামে এসেছিল। অমলদের বার-দালানেই তাদের থাকতে দেওয়া হয়েছে। বরপক্ষে কর্তা হয়ে এসেছিলেন বরের এক বড় জ্যাঠতুত ভাই। একটু বয়স হয়েছে। প্রথম স্ত্রী মারা যাবার পর অনেক পেড়াপিড়িতেও আর বিয়ে করেননি। আত্মীয় স্বজন একরকম আশা ছেড়েই দিয়েছিল তাঁকে রাজী করাবার। মঞ্জরীর মার অবস্থা সবাই জানে। তার উপর দয়া করে কুমুদ ডাক্তার নিজেই বুঝি গরিবের মেয়েকে উদ্ধার করবার জন্য অনুরোধ করেছিলেন, নেহাত ভাসাভাসা অনুরোধ। কিন্তু আশ্চর্যের কথা, ভদ্রলোক

এক কথায় রাজি হয়ে গিয়েছেন। মঞ্জরীকে ইতিমধ্যে তিনি কুমুদ ডাক্তারের বাড়ি যাতায়াত করতে দেখেছিলেন কিনা কে জানে, কিন্তু মেয়ে দেখবারও তিনি নাম করেননি।

মোহিত গহনা নিয়ে ফিরে না আসায় বেশ একটু গোল বেধেছিল অবশ্য। কিন্তু অমলের মার অনুগ্রহে সব ঠিক হয়ে গিয়েছে! বিয়ের পর দিনই মঞ্জরী চলে গিয়েছে স্বামীর সঙ্গে। তার সই মমতা শ্বশুর-বাড়ি যেতে কেঁদে ভাসিয়েছে কিন্তু মঞ্জরীর চোখে এক ফোঁটা জল কেউ দেখেনি। তবু মমতার ত বলতে গেলে কাছেই শ্বশুর-ঘর। একদিনে যাওয়া-আসা হয়। আর মঞ্জরীর স্বামী চাকুরি করে সুদূর বিদেশে—সেই আসামে কোন চায়ের বাগানে। কালে-ভদ্রেও কখনও আসতে পারবে কিনা সন্দেহ। সবাই অবাক হয়ে গিয়েছে তাই মঞ্জরীর ব্যবহারে! এ-সংসারে পাখিটা পোকাটা পর্যন্ত যার অত আপনার ছিল, সে অমন করে সব মায়া এক মুহূর্তে কাটায় কি করে!

আর সকলের সঙ্গে যাবার সময় অমলকেও মঞ্জরী প্রণাম করে গিয়েছিল, পায়ের ধুলো নিয়ে হেসে বলেছিল, "তোমার কাছে আমার একটা কিন্তু পাওনা আছে অমলদা।"

অমল হেসে বলেছিল, "খুব হিসেবী মেয়ে ত! যাবার আগে যত পাওনা-গণ্ডা বুঝি বুঝে নিচ্ছিস! কী আবার পাওনা ছিল তোর?"

"একটা মাথার তেল। মনে আছে বোধ হয়।"

অমল হেসে ফেলেছিল, "আচ্ছা, খুব লজ্জা দিয়েছিস! সত্যি একবারে ভুলে গেছলাম।"

"মনে করিয়ে দিলাম, এখন একটা কিনে পাঠাবে ত!"

অমল সকৌতুকে বলেছে, "তেল কিনে পাঠাব সেই আসামে! আমি তেল না পাঠালে তুই রুক্ষু চুলে থাকবি নাকি!"

"তাই যদি থাকি !" বলে হেসে মঞ্জরী চলে গিয়েছিল।

গাঁয়ের আরও নতুন খবর আছে বইকি! বিভূতি ঘোষ বসে থাকবার ছেলে নয়। সে একটা বিড়ির ফ্যাক্টরি করেছে গাঁয়ে। খুব ভালই চালাচ্ছে। মাঝি-বাউরির ছেলেগুলোর একটা হিল্লে হয়েছে। খেত-খামারের কাজে এখন তাদের পাওয়া দায়। রঙিন গেঞ্জি পরে বিড়ি-ফ্যাক্টরির আটচালায় বিড়ি পাকানই তারা পছন্দ করে বেশী।

সিধুখুড়োকে কিছুদিন থেকে আর দেখা যাচ্ছে না। কদিন আগে তার এক নতুন পাগলামি হয়েছিল, যখন তখন 'পেয়েছি! পেয়েছি!' বলে চিৎকার করা। তারপর সে একেবারে নিরুদ্দেশ।

আরও খবর আছে। চৌধুরীদের নামে থিয়ার বাবা নরেশ্বর মামলা করেছেন, শীতল-বাঁধের স্বত্ব দাবি করে। তিনিই নাকি সামন্তদের শেষ বংশধর।

অমলরা বোধহয় সামনবেড়ে ছেড়ে আবার কলকাতায় ফিরে যাবে। ব্রজবিনোদ রায়ের রোজনামচার ছেঁড়া খাতাটা মোহিতকে দিয়ে অনেকদিন আগে নরেশ্বর বাবুর কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিল। সেগুলো ফিরিয়ে আনতে একদিন থিয়াদের বাড়ি যাবে ভেবেছিল, কিন্তু আর এখন যাওয়া চলে না।

প্রেমেন্দ্র মিত্র

রবীন্দ্রোত্তর কালের মুষ্টিমেয় যে-কজন সাহিত্যিকের সনিষ্ঠ সাধনায় আধুনিক বাংলা সাহিত্য একটি সুদৃঢ় অথচ সুন্দর চারিত্র অর্জনে সমর্থ হয়েছে, প্রেমেন্দ্র মিত্র সেই স্বল্পসংখ্যকদেরই অন্যতম। অন্যতম, অথচ অনন্য। এ-কথা বলবার কারণ এই যে, তাঁর সাহিত্যে—শুধুই কথাসাহিত্যে নয়, প্রবন্ধে, গানে ও কবিতায়—এমন একটি রুচিমার্জিত ভাবনার এবং এমন একটি মমতাময় হৃদয়ের সান্নিধ্য লাভ করা যায়, অন্যত্র যা আদৌ সুলভ নয়। রবীন্দ্রনাথের পর তিনিই বোধহয় একমাত্র বাঙালী সাহিত্যিক, সাহিত্যের এত বিভিন্ন ক্ষেত্রে এত অনায়াসে যিনি পদচারণা করতে পেরেছেন। বস্তুত, যা-কিছুই তিনি ছুঁয়েছেন, প্রায় তা-ই সোনা হয়ে উঠেছে। ধুলোমুঠিকে সবাই সোনা করতে পারে না। প্রেমেন্দ্র মিত্র পারেন। তাঁর গল্প, উপন্যাস আর কবিতার বিষয়বস্তুর কথা চিন্তা করলেই এ-কথার তাৎপর্য বুঝতে পারা যাবে। সাধারণ সব মানুষরা তাঁর নায়ক, সাধারণ সব মানবীরা তাঁর নায়িকা। তাঁর কবিতার মধ্যেও এইসব সাধারণ মানুষেরই সুখ আর দুঃখ, আনন্দ আর যন্ত্রণার কথা তিনি বলতে চেয়েছেন। কিন্তু কী-এক আশ্চর্য জাদুমন্ত্রে সেই সাধারণ কথাও সেখানে অসাধারণ হয়ে উঠেছে। তাঁর সাহিত্যের কথা পরে আবার আসবে। তার আগে তাঁর ব্যক্তি-জীবনের দু-একটা জরুরী কথা বলে নেওয়া দরকার।

পুণ্যভূমি বারাণসীতে ১৯০৫ সনে তাঁর জন্ম। ছাত্রজীবন প্রথমে কলকাতায় ও পরে—অল্প কিছুকালের জন্য—ঢাকায় অতিবাহিত হয়েছে। অনেকেই হয়ত জানেন না, তাই বলে রাখা ভাল যে, তিনি এবং এ-যুগের অন্যতর লব্ধকীর্তি সাহিত্যিক অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত একসময়ে একই বিদ্যালয়ে একই শ্রেণীতে পড়তেন। প্রেমেন্দ্র মিত্রের প্রথম উপন্যাস 'পাঁক'। এ-বই যে একসময়ে বাংলা সাহিত্যে কী বিপুল চাঞ্চল্যের সৃষ্টি

করেছিল অনেকেরই তা মনে থাকতে পারে। অথচ, বইখানি যখন লেখা শুরু হয়, লেখকের বয়স তখন মাত্রই ১৪ বছর।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের কর্মজীবন বড় বিচিত্র। নানা পরিবেশে নানারকম মানুষের সঙ্গে নানা রকমের কাজ তাঁকে করতে হয়েছে। একসময়ে তিনি ছিলেন সাংবাদিক। বঙ্গবাণী, নবশক্তি, বাংলার কথা ইত্যাদি কাগজে তখন তিনি কাজ করেছেন। উত্তাল, অকরুণ, অস্থির যে নদীটিকে আমরা 'জীবন' বলে জানি, তার আরও অনেক ঘাটে তারপর তাঁকে ঘুরতে হয়েছে, কিন্তু প্রায় কোনওখানেই খুব বেশীদিনের জন্য তিনি বিশ্রাম নিতে পারেননি। কিছুকালের জন্য চলচ্চিত্র-জগতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। কাহিনীকার এবং পরিচালক হিসেবে তখন যে কী বিপুল সম্মান তিনি পেয়েছেন, তা কারও অজানা নয়। কিন্তু, এমন কি, ভারতীয় চলচ্চিত্র-জগতের রাজধানী বোম্বাইএর হাতছানিও এই অর্থকরী বৃত্তির মায়ায় তাঁকে বেঁধে রাখতে পারেনি। অর্থ, খ্যাতি, সামাজিক প্রতিষ্ঠা, এই সমস্ত-কিছুকে অনায়াসে আয়ত্ত করেও হয়ত তাঁর মনে হয়েছিল যে, এর কোনওকিছুই তাঁর মনের ক্ষুধাকে তৃপ্ত করতে পারছে না। তা নইলে সেই বিদ্যুৎ-ঝলসিত জীবনের সমস্ত আলো নিভিয়ে দিয়ে আবারও কেন তিনি এই জ্যোৎস্না-রাত্রির বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন? অর্থের জন্য নয়, খ্যাতির জন্য নয়, প্রতিষ্ঠার জন্য নয়। তাঁর সাহিত্য-সাধনায় একনিষ্ঠ থাকবার জন্য। এ ছাড়া আর এর অন্য-কোনও ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যায় না।

প্রেমেন্দ্র মিত্রকে, তাঁর 'সাগর থেকে ফেরা' কাব্যগ্রন্থের জন্য, সম্প্রতি অ্যাকাডেমি পুরস্কার ও রবীন্দ্র-পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে। মানবতন্ত্রী এই শিল্পীকে সম্মান জানিয়ে পুরস্কার-প্রদানের মৌল আদর্শকেই যে সম্মানিত করা হয়েছে, তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই।

* * *

আগেই বলেছি প্রেমেন্দ্র মিত্রের সাহিত্যপ্রতিভা বহুমুখী। সাহিত্যের বিশেষ কোনও একটি ক্ষেত্রের চতুঃসীমার মধ্যে সেই প্রতিভা আপনাকে আবদ্ধ করে রাখেনি। এ-কালের তিনি অগ্রগণ্য কবি। গল্পকার ও

ঔপন্যাসিক হিসেবে তাঁর শক্তি প্রায় অপরিমেয়। শিশুসাহিত্যেও অসামান্য তার দান। আবার—তাঁর প্রবন্ধের সংখ্যা যদিও খুব বেশী নয়—সাহিত্যে ও সমাজ-সমালোচনাতেও তাঁর লেখনী প্রায় সমান স্ফূর্তি লাভ করেছে। তবু, একটু ভেবে দেখলে বুঝতে কিছু অসুবিধে হয় না যে, যা-কিছুই তিনি লিখুন না কেন, তাঁর সমস্ত রচনার পিছনেই বিশেষ-একটি চিত্তপ্রবৃত্তি কাজ করে গিয়েছে। সে-চিত্ত এক আদর্শনিষ্ঠ কবির। তাঁর গল্প আর প্রবন্ধ হয়ত তাঁর কবি-চিত্তেরই এক অমোঘ সম্প্রসারণ।

লেখক হিসেবে প্রেমেন্দ্র মিত্রের স্বাতন্ত্র্য কোথায়? এ-প্রশ্নের উত্তর দেবার আগে একটু ভূমিকা করে নেওয়া দরকার। প্রেমেন্দ্র মিত্রের সাহিত্য-জীবনের যখন প্রথম উন্মেষ ঘটে, বাংলা দেশের সাহিত্যমহলে তখন এক তুমুল আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছে। এই আন্দোলনকে অনেকে বলেছেন রবীন্দ্র-বিরোধী আন্দোলন। কিন্তু কথাটা বোধ হয় ঠিক নয়। আন্দোলনটা আসলে ছিল গতানুগতিক চিন্তার বিরুদ্ধে, যে-চিন্তা আপনাকে নিয়েই সবসময়ে সন্তুষ্ট থাকতে চেয়েছে, বাইরের দিকে চোখ তুলে তাকাবার মতন সময় অথবা শক্তি যার ছিল না। আবার নতুন-কালের কথা যাঁদের গলায় শুনতে পাওয়া গেল, বাইরের দিকে তাকাতে গিয়ে ঘরের কথা তাঁরা ভুলে গেলেন। প্রেমেন্দ্র মিত্রের স্বাতন্ত্র্য এইখানে যে, ঘর আর বাইরের মধ্যে তিনি প্রায় সবসময়েই একটি সেতুবন্ধনের প্রয়াস পেয়েছেন। গতানুগতিকতাকে তিনি কখনও ক্ষমা করেননি বটে, কিন্তু গতানুগতিকতা আর ঐতিহ্য যে এক বস্তু নয়, তা তিনি জানতেন। তাঁর সাহিত্য অন্তত সেই কথাই বলবে। আপন দেশের ঐতিহ্যের প্রতি তাঁর সুগভীর শ্রদ্ধাই সেখানে একটি সুন্দর শিল্পরূপ নিয়েছে।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ, অন্তর মমতাময়। মানবহৃদয়ের অন্তর্নিহিত মৌল রহস্যগুলিকে তাঁর মত এত গভীরভাবে আর খুব কম শিল্পীই বোধ হয় উপলব্ধি করতে পেরেছেন। মানুষকে তিনি চিনেছেন, তাকে তিনি ভালবেসেছেন। ভালবেসেছেন তার সমস্ত দোষ, সমস্ত ত্রুটি, সমস্ত অক্ষমতা সত্ত্বেও। প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতা, উপন্যাস আর ছোটগল্প সেই অন্তহীন ভালবাসারই পরিচয় বহন করছে।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের সম্পূর্ণ গ্রন্থ-তালিকা

কবিতা : প্রথমা, সম্রাট, ফেরারী ফৌজ, শ্রেষ্ঠ কবিতা, সাগর থেকে ফেরা।

গল্পগ্রন্থ : বেনামী বন্দর, পুতুল ও প্রতিমা, অফুরন্ত, মৃত্তিকা, ধূলিধূসর, নিশীথ-নগরী, সামনে চড়াই, শ্রেষ্ঠ গল্প, স্বনির্বাচিত গল্প, সপ্ত-পদী, জলপায়রা।

উপন্যাস : পাঁক, পঙ্কশর, মিছিল, কুয়াশা, উপনায়ন, আগামী কাল, মৌসুমী।

শিশুসাহিত্য: পাতালে পাঁচ বছর, পিঁপড়ে-পুরাণ, সেরা গল্প, ড্রাগনের নিশ্বাস, পৃথিবী ছাড়িয়ে, ময়দানবের দ্বীপ, কুহকের দেশে ভয়ঙ্কর, দুঃস্বপ্নের দ্বীপ, ঝড়ের কালো মেঘ, গল্প আর গল্প, ঘনাদার গল্প। কুমির কুমির, জোনাকিরা।

প্রবন্ধ : বৃষ্টি এল।

ছায়াচিত্র-কাহিনী : হানাবাড়ি, প্রতিশোধ ইত্যাদি।